প্রকাশনার ৩৫ বছর

অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

পঁয়ত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ০৯

সেপ্টেম্বর ২০২০ ॥ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৭ ॥ মুহাররম-সফর ১৪৪২

প্রধান সম্পাদক

আনিস মাহমুদ

সম্পাদক

মোহাম্মদ আনোয়ার কবির

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭

অগ্রপথিক

নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই-মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক
অগ্রপথিক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : ifa.agropothik@gmail.com

স ম্পা দ কী য়

পবিত্র আশুরা

ইসলামের ইতিহাসে পবিত্র আশুরা অন্যতম ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। আরবী বর্ষ হিজরি সাল শুরু হয় মুহাররম মাসে। তাই মুহাররম মাস এমনিতেই গুরুত্বপূর্ন মাস। আর তার সঙ্গে সর্বশেষ ১০ মহররম অর্থাৎ পবিত্র আশুরার দিন ফোরাত নদীর তীরে কারবালার প্রান্তরে সংঘটিত হয়েছিল মানবেতিহাসের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা। সত্য ও ন্যায়ের পতাকাকে সমুন্নত রাখতে কারবালার প্রান্তরে শাহাদাতবরণ করেন মহানবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হুসাইন (রা)। হুসাইন (রা)-এর শাহাদত মুহাররম মাসের সকল ঘটনাকে ম্লান করে দেয়। যুগ যুগ ধরে কেয়ামত পর্যন্ত তাই আশুরার গুরুত্ব ও তাৎপর্য মুসলিম জীবনে অপরিসীম।

যুগে যুগে এই মুহাররম মাসের আশুরার দিনে সংঘটিত হয়েছিল অনেকগুলো ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মুহাররম মাসের সকল ঘটনাই ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানব জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মুহাররম মাসের সকল ঘটনার মধ্যেই মহান রাব্বুল আলামিন মানব জাতির জন্য অসংখ্য শিক্ষা উপকরণ রেখেছেন। এ সকল শিক্ষা যাতে যুগে যুগে মানব সভ্যতাকে বিকশিত করতে ভূমিকা রেখেছে। সর্বশেষ ইমাম হুসাইন (রা)-এর ঘটনা একদিকে চূড়ান্ত বেদনাদায়ক শোকাবহ মর্মস্পর্শী অপরদিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে জীবন উৎসর্গের অনন্য নজীর। ইসলামের এই সুমহান আত্মোৎসর্গ কিয়ামত পর্যন্ত সত্য সুন্দর ও ন্যায়ের পথে জীবন উৎসর্গ করতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে। পবিত্র আশুরার ইতিহাস ও শিক্ষা আমাদের জীবনে সফলভাবে আমৃত্যু প্রয়োগ করার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা আমাদের দান করুন।

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতিসংঘে ভাষণ দেয়ার ৪৬ বছর পূর্ণ হচ্ছে ২৬ সেপ্টেম্বর। বিশ্ব দরবার জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে প্রথম উচ্চারিত

হয় বাংলা ভাষা। বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবর্ষ মুজিববর্ষে এবার ভাষণটি নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে। এই ভাষণটি সারাবিশ্বের সমগ্র বাঙালি জাতির অমূল্য সম্পদ। যতদিন জাতিসংঘ থাকবে, বাংলা ভাষা থাকবে সকল অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস হবে এ ভাষণ। বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের এ অমূল্য সম্পদ বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘের ভাষণটি এ সংখ্যায় আমরা পুনর্মুদ্রন করলাম। একই সাথে সেসময়ে ভাষণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রখ্যাত কূটনীতিবিদ মরহুম ফারুক চৌধুরী'র ভাষণটি নিয়ে একটি স্মৃতিচারণ পুনর্মুদ্রণ করলাম। পাঠকেরা এ পুনর্মুদ্রনের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক একটি বিষয় সংরক্ষণ করতে পারবেন।

শুভ জন্মদিন

২৮ সেপ্টেম্বর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভ জন্মদিন। বাংলাদেশের অগ্রগতি ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য ১৯ বার অপচেষ্টা চালায়। মহান রাব্বুল আলামিনের অপরিসীম করুণায় প্রতিবার মৃত্যুর মুখ থেকে তিনি ফিরে এসেছেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে আজ বিশ্ব দরবারে গৌরবের সাথে সমুন্নত হয়েছে আমাদের ভাবমূর্তি। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য রাত দিন নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশ তাঁর হাত দিয়ে দরিদ্র থেকে স্বল্প আয়ের দেশে উন্নত হয়েছে। সারাবিশ্বে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব আজ বিপুলভাবে প্রশংসিত। উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয় শেখ হাসিনার নেতৃত্বের বাংলাদেশকে। মহান রাব্বুল আলামিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। যাতে এই দেশের গরীব দুঃখী জনগণ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা কায়েম করে উন্নত বাংলাদেশ তৈরিতে সফল হয়। শুভ জন্মদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

আশা করি অগ্রপথিকের বর্তমান সংখ্যাটি আপনাদের প্রত্যাশা অনেকাংশে পূরণ করবে।♦

সূচি

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

পবিত্র আশুরা ও হিজরি সন
মুফতী শাঈখ মুহাম্মদ উছমান গণী
হিজরি সন নববর্ষ ও প্রাত্যহিক জীবনে হিজরি সনের গুরুত্ব ♦৯
মাওলানা ডা. নবীর আহমেদ
হাদিসের আলোকে আশুরার দিনের ফজিলত ও তাৎপর্য ♦১৩

আন্তর্জাতিক
মূল : সাঈদ মুহাম্মদ রিজভি
অনুবাদ : মুস্তাফা মাসুদ
ইসলামে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ♦২১

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ৪৬ বছর
জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বাংলা ভাষণ ♦২৬
ফারুক চৌধুরী
জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের স্মৃতিচারণ ♦৩৪

শুভ জন্মদিন
শামস সাঈদ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভ জন্মদিন, অপ্রতিরোধ্য পথ-পরিক্রমায় শেখ হাসিনা ♦৩৮
প্রত্যয় জসীম
বঙ্গবন্ধু-নজরুলের জীবনচেতনা ও রাষ্ট্রচিন্তার ঐক্য ♦৪৯
আতাতুর্ক কামাল পাশা
জাতির একটি দুঃখবহ দিন ♦৭১
ড. মওলানা ঈসা শাহেদী
মওলানা রূমীর মসনবী শরীফের গল্প, সুলতান মাহমুদ ও চোরের আড্ডা ♦৭৭
মাহমুদ জামাল
কুমারখালীর পীর-আউলিয়া ও ধর্মীয় সংস্কারকগণ ♦৮৬
প্রফেসর ড. আবদুল জলিল
মোবাইল ও স্মার্ট ফোন ও অদৃশ্য এক ভয়ঙ্কর নীরব ঘাতক ♦১১৭
মো. জিয়াউর রহমান
স্বাস্থ্যনিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনীতি ♦১২১

কবিতা

সোহরাব পাশা
বঙ্গরত্ন শেখ হাসিনা ♦৯২
খালেক বিন জয়েনউদদীন
আঁধারের সিঁড়ি ভেঙে ♦৯৩
আনোয়ার কবির
কবিতার যাত্রা ♦৯৪
মিলন সব্যসাচী
নীরব নিথর গানের পাখি ♦৯৫
খান-চমন-ই-ইলাহি
শেখ হাসিনার জন্মদিন ♦৯৬
আসাদুল্লাহ
মায়ের কোন কবিতা হয় না ♦৯৭
ফারুক হাসান
নিরস সময়গুলো ♦৯৮
মুহাম্মাদ আবদুল্লাহিল বাকী
স্মৃতির বিষাদ ♦৯৯

গল্প

দেলোয়ার হোসেন
ট্রেনে যেতে যেতে ♦১০০

সাহিত্য

কাজী আখতারউদ্দিন
শেখ সাদীর কবিতা জাতিসংঘ দপ্তরের প্রবেশদ্বারে আদর্শবাণী বা মূলমন্ত্র ♦১০৬
অনুবাদ : গাজী সাইফুল ইসলাম
প্রখ্যাত তাজিক কবি লায়েক শের আলির কবিতা ♦১১৩

পরশমণি

আল-কুরআন

১। নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত, এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। (সূরা তাওবা : আয়াত : ৩৬)

২। আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত থাকবে। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। (সূরা আহযাব : আয়াত : ৩৩)

৩। আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয়েছেন তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। (সূরা বাকারা : ১৫৪)

৪। এই সুসংবাদটি আল্লাহ দেন তাঁর বান্দাদেরকে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। বলুন, 'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আমার আত্মীয়ের হৃদ্যতা ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।' যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য এত কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (সূরা শূরা : ২৩)

৬। আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, নিধন করে ও শহীদ হয়। তাওরাত ইঞ্জিল ও কুরআনে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি হয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে আছে? তোমরা যে সাওদা করেছ সে সাওদার জন্য আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সাফল্য। (সূরা তাওবা : ১১১)

আল-হাদীস

১। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) প্রত্যুষে বের হলেন, তখন তার শরীর মোবারকে কালো ডোরা দাগ বিশিষ্ট কম্বল মোড়ানো ছিল। অতঃপর তার নিকট আসলেন ইমাম হাসান (রা) নবীজী তাকে কম্বলের মধ্যে শামিল করলেন, এরপর আসলেন হযরত ইমাম হুসাইন (রা) নবীজী তাকেও শামিল করে নিলেন। অতঃপর আসলেন হযরত ফাতিমা (রা) নবীজী তাকেও (কম্বলে) প্রবেশ করিয়ে নিলেন; আর পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন- 'হে আহলে বায়ত! নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক চান, তোমাদের মধ্য থেকে যাবতীয় অপবিত্রতা দূরীভূত করতে এবং আরো চান তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে পরিচ্ছন্ন করতে।' (মুসলিম শরীফ)

২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি আশুরার দিন দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত শোকাহত, তার চুলগুলো উসকো খুসকো। এমতাবস্থায় একটি রক্তভরা শিশি নিয়ে তিনি উপস্থিত। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সা) এই রক্ত কিসের? নবীজী বললেন, এইমাত্র হুসাইন এবং তার সাথীদের রক্ত কারবালার মাটিতে পড়েছে, আমি উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি তারিখটা স্মরন রাখলাম। পরে জানতে পারলাম, নবীজী (সা) যে সময় রক্তের শিশি হাতে নিয়ে আমার সামনে এসেছিলেন, ঠিক সেই সময় হযরত হুসাইন (রা) কারবালায় শাহাদত বরণ করেছেন। (মিশকাত শরীফ)

৪। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন মদিনায় আগমন করেন তখন তিনি ইহুদিদের দেখতে পেলেন তারা আশুরার দিবসে সিয়াম পালন করছে, তাদের জিজ্ঞেস করা হলো, তোমরা এ দিন রোযা রাখছ কেন? তারা বলল এ দিন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ) ও বনি ইসরাইলকে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের ওপর বিজয় দান করেছেন, তাই আমরা এ দিনের সম্মান ও মহত্ত্বের জন্য রোযা পালন করি। তাদের প্রতি উত্তরে সরকারে দোআলম (সা) ইরশাত করলেন, 'আমরা তোমাদের চেয়ে মূসার উত্তম অনুসারী, অতঃপর তিনি এ দিনের রোযা রাখতে সাহাবিদের নির্দেশ দেন।' (বুখারী শরীফ)

হিজরি সন নববর্ষ ও প্রাত্যহিক জীবনে হিজরি সনের গুরুত্ব

মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

হিজরী সাল ১৪৪১ বিদায় নিয়ে এলো নববর্ষ ১৪৪২ সন। ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান হিজরী সন তথা আরবী তারিখ ও চান্দ্র মাসের সাথে সম্পর্কিত। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও আনন্দ-উৎসবসহ সব ক্ষেত্রেই মুসলিম উম্মাহ হিজরী সনের ওপর নির্ভরশীল। যেসব ঐতিহাসিক উপাদান মুসলিম উম্মাহকে উজ্জীবিত করে তন্মধ্যে হিজরী সন অন্যতম। বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সভ্যতা সংস্কৃতিতে ও মুসলিম জীবনে হিজরি সনের গুরুত্ব অপরিসীম। হিজরী সনের সাথে মুসলিম উম্মাহর তাহজীব-তামাদ্দুনিক ঐতিহ্য সম্পৃক্ত।

মানব জীবন সময়ের সমষ্টি। সময়কে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহারোপযোগী করে আল্লাহ তাআলা প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন: দিন রাত, মাস, বছর ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: “নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস

গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান" (সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৬)। "তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং উহাদের মনজিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এ সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন" (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫)। "আর সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চন্দ্রের জন্য অমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনজিল; অবশেষে উহা শুষ্ক বক্র পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে।" (সূরা ইয়াছীন, আয়াত: ৩৮-৩৯)

তৎকালীন আরবে সুনির্দিষ্ট কোনো সন প্রচলিত ছিলো না। বিশেষ ঘটনার নামে বছরগুলোর নামকরণ করা হতো। যেমন, বিদায়ের বছর, অনুমতির বছর, হস্তীর বছর ইত্যাদি। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হজরত উমর (রা) যখন খলীফা হন, তখন বহু দূর পর্যন্ত নতুন ও ভূখণ্ড ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাষ্ট্রীয় কাগজপত্র ইত্যাদিতে সন তারিখ উল্লেখ না থাকায় অসুবিধা হতো। আল বেরুনীর বিবরণী থেকে জানা যায়, হজরত আবু মূসা আশআরী (রা) একটি পত্রে উমর (রা)-কে অবিহিত করেন, সরকারী চিঠিপত্রে সন তারিখ না থাকায় আমাদের অসুবিধা হয়। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে হজরত উমর (রা) একটি সন চালু করেন। আল্লামা শিবলী নোমানী (র) হিজরী সনের প্রচলন সম্পর্কে 'আল ফারূক' গ্রন্থে উল্লেখ করেন: হজরত উমর (রা) এর শাসনামলে ১৬ হিজরী সনের শাবান মাসে খলীফা উমরের কাছে একটি দাপ্তরিকপত্রের খসড়া পেশ করা হয়, পত্রটিতে মাসের উল্লেখ ছিলো; সনের উল্লেখ ছিলো না। খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, পরবর্তী কোনো সময়ে তা কিভাবে বোঝা যাবে এটি কোন সনে পেশ করা হয়েছিলো? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর না পেয়ে হজরত উমর (রা) সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য শীর্ষ পর্যায়ের জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় হিজরতের ১৬ বছর পর ১০ জুমাদাল উলা ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে। হিজরতের বছর থেকে সন গণনার পরামর্শ দেন হজরত আলী (রা)। পবিত্র মুহাররম মাস থেকে ইসলামী বর্ষ হিজরী সনের শুরু করার ও জিলহজ মাসকে সর্বশেষ মাস হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ দেন হজরত উসমান (রা)। (বুখারি ও আবু দাউদ)

৬২২ সালের জুন মাসের শেষার্ধে আরবী রবিউল আউয়াল মাসে প্রিয় নবীজি (সা)-এর মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের ঘটনা মুসলমানদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সে নিরিখেই ইসলামী 'হিজরী সন' সন প্রবর্তন করা হয়। হিজরত মানে ছেড়ে যাওয়া, পরিত্যাগ করা; দেশান্তর হওয়া ও

দেশান্তরিত করা। পরিভাষায় হিজরত হলো- ধর্মের জন্য এক স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে চলে যাওয়া। কামনা বাসনা বিসর্জন দেওয়া, সংযম অবলম্বন ও আত্মনিয়ন্ত্র এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য পরিত্যাগ করাই হিজরতের মূল দর্শন।

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনাবাসীদের দীনী দাওয়াত ও তালীমের জন্য হজরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রা) ও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) কে প্রেরণ করলেন। এর পর হজরত আম্মার (রা), হজরত বিলাল (রা) ও হজরত সাআদ (রা)-কে মদীনায় প্রেরণ করলেন। অবশেষে নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরত করেন। রাসূলে আকরাম (সা) মদীনা মুনাওরায় প্রবেশের আগে কুবায় বনী সালেম উপত্যকায় অবস্থান করলেন। তিনি তথায় একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন, এটি মদীনার প্রথম মসজিদ। এ মসজিদ নির্মাণের সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সবার সাথে পাথর-মাটি বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর নবী কারীম (সা) জুমুআর দিনে মদীনায় প্রবেশ করলেন।

নবীয়ে আকরাম (সা) যখন মদীনা শরীফে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে বরণ করার জন্য তাঁর উষ্ট্রীর দড়ি নিয়ে টানাটানি শুরু হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, উষ্ট্রীকে ছেড়ে দাও। যেখানে সে বসবে, সেটাই হবে আমার বাসস্থান। তাকে এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উষ্ট্রী বনু নাজ্জার গোত্রের এলাকায় গিয়ে দাঁড়াল। এখানেই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নানার বাড়ী ছিলো। এ গোত্রের হজরত আবু আইযূব আনসারী (রা)-এর বাড়ীর সামনে গিয়ে উষ্ট্রী বসে পড়ল। এখানেই নবীয়ে আখেরুজজামান (সা)-এর বাসস্থান নির্ধারণ করা হল। এখানেই গড়ে উঠল মসজিদে নববী ও মদীনাতুর রাসূল বা রাসূলের শহর। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, যাদুল মাআদ, তারীখুল ইসলাম)

সময় আল্লাহর দান। নতুন বছর আসা মানে জীবনের নির্ধারিত আয়ূ থেকে একটি বছর চলে যাওয়া। নতুন বছর আসা মানে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হওয়া। বিগত সময়ের ব্যর্থতা গ্লানি ভুলে নব উদ্যমে নতুন সফলতার পানে এগিয়ে যাওয়া, অবারিত কল্যাণের পথে ধাবিত হওয়ার শুভ যাত্রা। তাই নতুন বছরে হজরত আলী (রা) বলতেন: "ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূবি ওয়াল আবছার, ইয়া মুদাব্বিরাল্লাইলি ওয়ান-নাহার; ইয়া মুহাওয়িলাল হাওলি ওয়াল আহওয়াল, হাওয়িল হালানা ইলা আহ্ছানিল হাল।" অর্থ: 'হে অন্তরসমূহ ও দৃষ্টিসমূহ পরিবর্তনকারী! হে রাত ও দিনের আবর্তনকারী! হে সময় ও অবস্থা

বিবর্তনকারী! আমাদের অবস্থা ভালোর দিকে উন্নীত করুন।' (দিওয়ানে আলী, আন নাহজুল বালাগা)

নতুন বছরের সাথে আসে নতুন চাঁদ ও নতুন মাস। নতুন চাঁদে নতুন মাসে রাসূলে খোদা (সা) পড়তেন: "আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমান, ওয়াছ ছালামাতি য়াল ইছলাম; ওয়াত্-তাওফীকি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারদা; রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লাহ; হিলালু রুশদিন ওয়া খায়র।" অর্থ: 'আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ! এই মাসকে আমাদের জন্য নিরাপত্তা, ঈমান, প্রশান্তি ও ইসলাম সহযোগে আনয়ন করুন; আমাদের তাওফীক দিন আপনার মহব্বত ও সন্তুষ্টির; আমার ও তোমার প্রভূ আল্লাহ! এই চান্দ্র মাস সুপথ ও কল্যাণের।' (তিরমিযী: ৩৪৪৭ ও ৩৪৫১, মুসনাদে আহমাদ: ১৪০০, রিয়াদুস সলিহীন: ১২৩৬)।

বাংলা হিজরী সন

বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ মূল হিজরী সন থেকে এসেছে। বাদশাহ আকবর খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য তাঁর সভাসদ জ্যোতির্বিদ আমির ফতেহ উল্লাহ শিরাজীর সহযোগিতায় ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের ১০ বা ১১ মার্চ থেকে 'তারিখ-এ-এলাহি' নামে নতুন এক বছর গণনা পদ্ধতি চালু করেন। নতুন এই সাল আকবরের রাজত্বের ২৯তম বর্ষে চালু হলেও তা গণনা আরম্ভ হয় ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর থেকেই, কারণ ওই দিনেই তিনি 'দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ' জয়লাভ করেছিলেন। তৎকালীন হিজরী চান্দ্র বর্ষকে অপরিবর্তিত রেখে সৌর বর্ষ গণনা শুরু করেন। অর্থাৎ ঐ বছর থেকে বাংলা মাসের হিসেবে ৩৬৫ দিনে বছর হিসেব করা হয়। যা পূর্বে চান্দ্র মাস হিসেবে ৩৫৫ দিনে বছর হিসেব হতো। তাই এটি সৌর ও চন্দ্র বর্ষের মিশ্রণ।

হিজরী সৌরবর্ষ ও চান্দ্রবর্ষ

আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে বলেন– 'সূর্য ও চন্দ্র হিসাবের নিমিত্তে।' (সূরা আর রহমান, আয়াত : ৫)। সৌর বর্ষ হয় সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর আবর্তনে। সৌর মাস হয় ৩০, ৩১ ও ২৮-২৯ দিনে। চান্দ্র বর্ষ হয় পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদের আবর্তনে। চান্দ্র মাস হয় ২৯ ও ৩০ দিনে। এই কারণে চান্দ্র বর্ষ সৌর বর্ষ অপেক্ষা ১০-১১ দিন কম হয় তাই প্রতি ৩ বছরে ১ মাস বেড়ে যায় এবং ৩৬ বছরে ১ বছর বৃদ্ধি হয়। প্রতি শতাব্দীতে ৩ বছরের পার্থক্য হয়। আরব দেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে হিজরী সনের সৌর বর্ষ ও চান্দ্র বর্ষ দুটি-ই চালু আছে। হিজরী সৌর বর্ষকে 'হিজরী শামসী' এবং হিজরী চান্দ্র বর্ষকে 'হিজরী কমারী'বলা হয়।♦

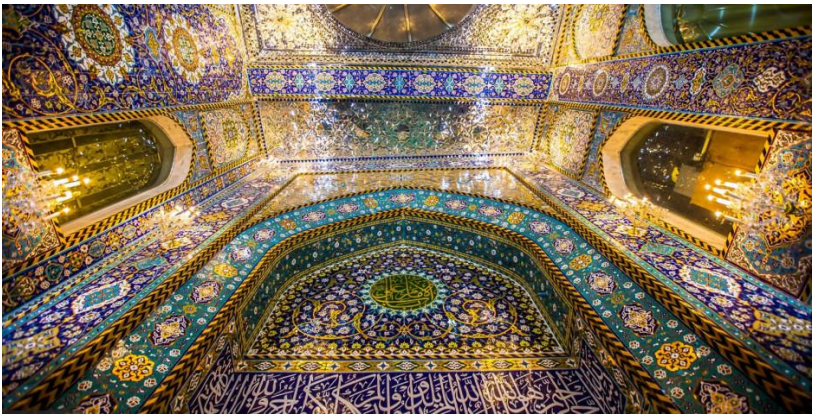

হাদিসের আলোকে আশুরার দিনের ফযিলত ও তাৎপর্য

ডা. মাওলানা নবীর আহমেদ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী কারীম (সা) মদীনায় এসে ইয়াহুদীদেরকে দেখলেন, তারা আশুরার দিনে রোযা পালন করছে। তিনি তাদের নিকট এ দিনের মহাত্ম সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তারা বললো: এটি একটি কল্যাণময় দিন। এটি এমন একটি দিন যে দিনে মহান আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদেরকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করেছেন। এ কারণে হযরত মূসা (আ) এ দিনে রোযা রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: তাহলে আমি তো তোমাদের চেয়েও হযরত মূসা (আ) (ঘটনা স্বরণের) অধিক হকদার। অতঃপর তিনি সে দিনে রোযা রাখলেন এবং (সাহাবায়ে কেরামগণকেও) সেদিন রোযা রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন। (সহীহ বুখারী, বাবু-সিয়ামু ইয়াওমু আশুরা, ২য় খন্ড, পৃ-৭০৪, হাদীস নং ১৯০০)

হাদীসটির রাবী বা বর্ণনাকারীর পরিচয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাত ভাই। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এর পুত্র। এ ছাড়া তার মাতা লুবাবাহ বিনতুল হারিস ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্নী হযরত মাইমুনাহ (রা)-এর বোন। ফলে বাবা এবং মা উভয়ের দিক থেকেই তিনি

ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ছিলেন সকলের মাঝে অতিশয় সম্মান, মার্যাদা ও গৌরবের অধীকারী। হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবুওয়াতের দশম বছর তাঁর জন্ম হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের সময় তার বয়স হয়েছিল ১৩ থেকে ১৪ বছর।

অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। তাঁর জ্ঞান গরিমা ও পাণ্ডিত্য বিবেচনা করেই তাঁকে (হাবরুল উম্মাতি ওয়া বাহরুহা) অর্থাৎ এই উম্মতের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অতি উঁচুমানের ব্যক্তিত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শিশু অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্য দু'আ করে বলেছিলেন, (আল্লাহুম্মা ফাক্কিহ্য ফি দ্বীনি ওয়া আল্লামাহু) অর্থ হে আল্লাহ! তাঁকে তুমি দ্বীনের সঠিক বুঝ দাও এবং দ্বীনের যর্থাথ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞান দান কর। পরবর্তীতে তিনি রাঈসুল মুফাসসিরীন বা মুফাস্সির গণের সরদার নামে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি দুই দুই বার হযরত জিবরীল (আ)-কে দেখতে পান। দ্বিতীয় খলীফা হযর উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁকে ডেকে নিয়ে তার সঙ্গে পরার্মশ করতেন, যদিও তিনি ছিলেন অনেক সাহাবীর তুলনায় বয়কনিষ্ঠ।

অর্থাৎ বয়সে ছোট হলেও তিনি ছিলেন অনেক বয়োজৈষ্ঠ্য সাহাবীগণের তুলনায় অধিক জ্ঞানী ও বিচক্ষণ। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আর প্রভাবে (বরকতে) তিনি এতটা প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণতার অধিকারি হতে পেরেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত হাদীস সমূহের প্রচার ও প্রসারে তাঁর বিশাল অবদান রয়েছে। বাল্যকালে মাত্র কয়েক বছর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংস্পর্শে থেকে তিনি হাদীস সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৬০ টি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)-এর শাসনামলে ৬৮ হিজরী সালে তায়েফে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

আলোচ্য হাদীসের বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব

হাদীসটিতে আশুরার দিনের রোযা ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আশুরা আরবী শব্দ। এর মূল হলো "আশারাহ। যার অর্থ দশ। আরবী মুহাররম মাসের দশ তারিখ 'আশুরা নামে খ্যাত'। গুরুত্বপূর্ণ অনেক ঘটনার জন্য এ দিনটি মুসলিম উম্মাহর কাছে স্বরণীয় হয়ে আছে।

তম্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনাটি হলো- এই দিনে ক্ষমতাদর্পী ফিরাউনকে মহান আল্লাহ তা'আলা তার সম্প্রদায়সহ ধ্বংস করেছিলেন। আর হযরত মুসা (আ) এবং তাঁর সাথী সঙ্গী বণী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে নাজাত দিয়েছিলেন। আল্লাহর নবী হযরত মুসা (আ) ও বনী ইসরাঈলের নাজাতের

ঘটনায় শুকরিয়া হিসেবে এই দিনে সিয়াম পালনের রেওয়ায আগে থেকেই যারী ছিল। হযরত মুসা (আ) নিজেও এ ঘটনার শুকরিয়া আদায়ের জন্য এ দিনে সিয়াম পালন করতেন। মুসলমানদের উপরও রমযানের সিয়াম ফরজ হওয়ার আগে আশুরার এই সাওম ফরজ ছিল। মদীনায় হিজরত করে এসে রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানকার ইয়াহুদীদেরকে সেদিন সাওম পালন করতে দেখেন। এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে, পূর্বেকার নবী ও রাসূলগণের সাথে শেষ নবীব যোগসূত্রতা এবং তাদের বিধি বিধানের সাথে একাত্মতা প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া এর মাধ্যমে আশুরার সাওমের ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পর্কে জানা গেছে। তাই মুসলিমগণের জন্য হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ হাদীসটির শুরুতে রাসূলে মাকবুল (সা) ইয়াহুদীদের নিকট জানতে চাইলেন যে, তোমরা কেন এই দিনে সাওম পালন কর? তারা তাকে জানালো যে, এই দিনে মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) এবং বনি ইসরাঈলদেরকে নাজাত দিয়েছিলেন। এর শুকরিয়া আদায়ের জন্য হযরত মূসা (আ) নিজেই সেদিন সাওম পালন করলেন। আর তাই আমরাও সেদিন রোযা পালন করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন যে, তোমাদের চেয়ে তো তাহলে আমাদের এই দিনে শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে রোযা পালন আরো বেশি জরুরী। এরপর তিনি তাই করলেন। হাদীসটির উক্ত বর্ণনা থেকে যেসব বিষয় বেরিয়ে এসেছে তা হলোঃ ----

নবী ও রাসূলগণ পরস্পর ভাই ভাই। তাঁদের দ্বীন এক ও অভিন্ন। তবে শরী'আত তথা দ্বীনের খুটিনাটি বিধিবিধানের মাঝে কিছুটা তারতম্য আছে। যেমন এক হাদীসের বর্ণনা:হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি দুনিয়া এবং আখিরাতে "হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) এর অধিক নিকটতর। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তাদের ঈমান এক; কিন্তু শরী'আত ভিন্ন। হাদীসটি বুখারী এবং মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। (আলমুসতাদরাক আলাআস সহীহাইন ২য়-খন্ড, পৃষ্টা: ৬৪৮, হাদীস নং- ৪১৫৩)

হাদীস দুটিতে সকল নবীগণের ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়েছে অতঃপর বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আ)-এর কথা বলা হয়েছে। কেননা তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর পূর্ববর্তী নবী ও রাসূল। তাদের দুই জনের মাঝখানে অন্য কোন নবী বা রাসূলের আগমন ঘটেনি। হযরত মূসা (আ) যেহেতু আরো অনেক আগের নবী ছিলেন এবং আলোচ্য হাদীসে তাঁর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেকে আরো অগ্রগণ্য বা অধিক হকদার বলে দাবী করেছেন, তাই এ কথা প্রমাণিত যে, সকল নবী এবং রাসূলগণই একসূত্রে গাঁথা। তাঁদের দাওয়াতী মিশন

ছিল এক ও অভিন্ন। তাঁরা সকলেই মহান আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের দিকে মানুষদেরকে ডেকেছেন এবং নিজেকে তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল বলে দাবী করতেন।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিম্নোক্ত হাদীসগুলো আরো স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য বহন করে: হযরত জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার এবং অন্যান্য নবীগণের দৃষ্টান্ত হলা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি ঘর নির্মাণ করলো এবং তা উত্তমরূপে পরিপূর্ণ করলো। তবে একটি ইটের পরিমাণ জায়গা খালি রেখে দিল। লোকেরা এ ঘরে প্রবেশ করে এর সৌন্দর্যে অভিভূত হলো। আবার (এর ঘাটতিটুকু দেখে) অবাক হয়ে বলে উঠলো এই ইটের জায়গাটা এমন না হলে (তাহলে কতই না সুন্দর হতো) (সহীহ বুখারী, খাতামুন্নাবীয়্যিন অধ্যায়, ৩য়-খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩০০, হাদীস নং- ৩৩৪১)

সহীহ বুখারীতে উক্ত অধ্যায়ের ৩৩৪২ নং হাদীসে আরো পরিষ্কারভাবে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে: হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার এবং আমার পূর্বেকার অন্যান্য নবীগণের দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মতো, যে একটি ঘর নির্মাণ করেছে এবং তা উত্তমরুপে পরিপাটি করে সাজিয়েছে। তবে এক কোণায় একটি ইটের পরিমাণ জায়গা ছাড়া। মানুষেরা এই ঘরে প্রবেশ করে এর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়, আবার (এর ঘাটতিটুকু দেখে) অবাক হয়ে বলে, হায় যদি এই ইটটিও (যথাস্থানে) স্থাপন করা হতো। (তাহলে কতইনা সুন্দর হতো)। নবী কারীম (সা) বলেন, আমিই হলাম (নবুয়াতের ইমারতের) সেই (শেষ ইট) এবং শেষ নবী ।

সুতরাং নবী ও রাসূলগণ পরস্পর ভাই ভাই তাঁরা সকলেই একই দ্বীন তথা আল ইসলাম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মাঝে সেই দ্বীনের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তাঁরা কাজ করেছেন। নবী ও রাসূলগণের নিকট নাযিল হওয়া দ্বীন এক ও অভিন্ন। শরী'আতের কিছুটা তারতম্য ছিলো- নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

দ্বীনের মৌলিক বিধান তথা সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ সকল নবী-রাসূলগণের সময়ই ছিল। তবে তার সময়কাল, পরিমাণ ও আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদিতে তারতম্য ছিল। ওযু, গোসল, পবিত্রতা অর্জন, বিবাহ-তালাক ইত্যাদি বিষয়ও অন্যান্য সকল নবীগণের সময়ই ছিল। কেবল মাত্র এর মধ্যে খুটিনাটি বিধানে কিছুটা তারতম্য ছিল।

মহান আল্লাহ তা'আলার দেয়া কোনো কোনো নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সাওম, পালন করার বৈধতা রয়েছে। আগেকার নবীগণ এবং তাঁদের উম্মতেরাও তা পালন করতো। আমাদের সময়ে আমরাও করতেছি।

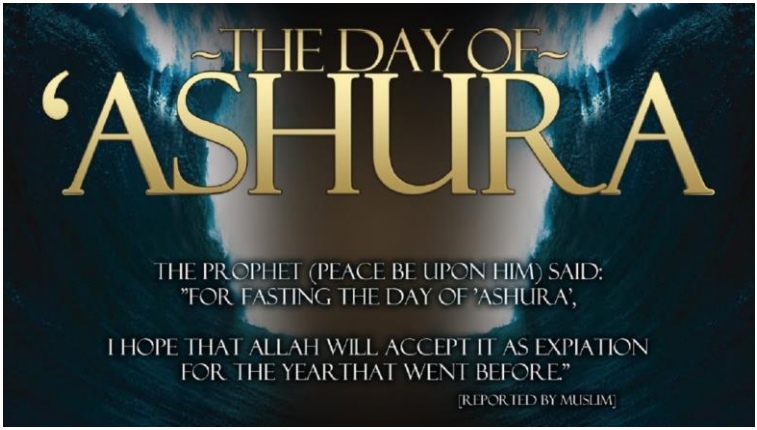

নেতা নিজেই কোন কাজ করে তারপর তার আদেশ করলে সেই আদেশ অনুসারীরা সহজে এবং নির্দ্বিধায় পালন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাই নিজেই আগে 'আশুরার রোযা পালন করলেন তারপর সাহাবীদেরকে তা পালনের নির্দেশ দিলেন।

পূর্বেকার নবী ও রাসূলগণের রেখে যাওয়া কোন বিধান যদি পরবর্তী শরী'আতে রহিত না হয়ে থাকে তাহলে তা পালন করা যাবে।

সকল যুগের তাওহীদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই এক ও অভিন্ন। তাই পূর্ববর্তীদের সফলতা ও বিফলতা পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।

আশুরার সাওমের মর্যাদা ও ফযীলত

আশুরার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। এ দিনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে ছিল বিভিন্ন নবী-রাসীলগণের সময়ে। এ কারণে এ দিনের মর্যাদা ও ফযীলত অনেক বেশি। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফের কতিপয় বর্ণনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে কুরাইশরা 'আশুরার দিনে রোযা পালন করতেন। মদীনায় এসেও তিনি এই দিনে রোযা পালন করেছেন এবং রোযা পালনের আদেশ দিয়েছেন। অতঃপর যখন রমাযানের রোযা ফরয হলো, তখন 'আশুরার রোযা (ফরয) হিসেবে থাকলো না। তখন যার ইচ্ছা এই দিনে রোযা পালন করলো, আর যার ইচ্ছা তা বর্জন করলো। (সুনানে আবী দাউদ, ২য় খন্ড, পৃষ্টা: ৩২৬, হা: নং- ২৪৪২)

অন্য হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এসে ইয়াহুদীদেরকে আশুরার দিন সাওমরত

দেখতে পেলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন দিন এটি, যাতে তোমরা সাওম বা রোযা পালন করছো। তারা বললো, এটি এক মহান দিন। অতঃপর হযরত মূসা (আ) শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে এ দিনে সাওম পালন করেছেন। তাই আমরাও এ দিনে সাওম পালন করি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন: আমরা তো তোমাদের চেয়ে হযরত মূসা (আ)-এর বেশী হকদার। তাই তিনি এ দিনে রোযা পালন করলেন এবং (অন্যদেরকে) এ দিনের রোযা পালনের নির্দেশ দিলেন। (সুনানে বায়হাকী, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ২৮৬, হা:নং ৮১৮০)

সহীহ ইবনে হিব্বানের বর্ণনায় এসেছে: "হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জাহেলী যুগে কুরাইশরা 'আশুরার দিনে সাওম পালন করতো। নবী (সা) যখন মদীনায় আসলেন তখন তিনি এই দিনে সাওম পালন করেছেন এবং সাওম পালনের আদেশ দিয়েছেন। অতঃপর যখন রমযানের সাওম ফরয হলো, তখন আশুরার সাওম আর (ফরয হিসেবে) থাকলো না। তখন যার ইচ্ছা এই দিনে সাওম পালন করলো আর যার ইচ্ছা তা বর্জন করলো (সহীহ ইবনে হিব্বান) ৮ম খন্ড, পৃ: ৩৮৫)

সহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনার আলোকে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে কুরাইশরা 'আশুরার দিনে রোযা পালন করতেন। মদীনায় হিজরত করে এসেও তিনি এই দিনে রোযা পালন করেছেন এবং রোযা পালনের আদেশ দিয়েছেন। অতঃপর যখন রমযানের রোযা ফরয হলো তখন তিনি বললেন, যার ইচ্ছা এই দিনে রোযা পালন করবে আর যার ইচ্ছা তা বর্জন করবে। (সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৯২, হা:নং ১১২৫)

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে প্রতিয়মান হয় যে, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ আশুরার রোযাকে ফরয হিসেবেই পালন করতেন। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর তিনি তা নিজের জন্যেও ঐচ্ছিক বা অতিরিক্ত, নফল ইবাদতের মধ্যে গণ্য করে দেন। তবে আশুরার ফযীলত অনেক এবং এর গুরুত্ব ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। আগেকার নবীগণও এই দিনে রোযা পালন করতেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলো প্রণিধানযোগ্য।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন: আশুরার দিনে সকল নবীগণ রোযা পালন করতেন। অতএব, তোমরাও তাতে রোযা পালন করো। (আশুরার ফযীলত বর্ণনা করে এ হাদীসে বলা হয়েছে:

হযরত আবু কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম (সা) বলেছেন: আশুরার দিনে রোযার মাধ্যমে আমি আশা করছি যে, মাহন আল্লাহ পূর্ববর্তী

বছরের গুনাহ মাফ করবেন। (সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, পৃ: ১২৬, হা:নং - ৭৫২)

সহীহ ইবন হিব্বানে উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত আছে: হযরত কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী কারীম (সা) কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা) কেউ যদি আশুরার দিনে রোযা পালন করে তাহলে তার কী মর্যাদা? তিনি বললেন: এ তো সারা বছর রোযা পালনের মতো। লোকটি বললো: আর যদি কেউ আরাফার দিন রোযা পালন করে? তিনি বললেন: এটি এ বছর এবং তার আগের বছরের গুনাহ মাফ করে। (সহীহ ইবনে হিব্বান, ৮ম খন্ড, পৃ- ৩৯৪, হা:নং- ৩৬৩১)

হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আশুরা এমন এক (মর্যাদাপূর্ণ) দিন যে দিনে জাহেলী যুগেও আমরা রোযা পালন করতাম। এরপর যখন রমযানের রোযার বিধান নাযিল হলে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এটি মহান আল্লাহর দিন-সমূহের একটি। কাজেই যার ইচ্ছা হয় এই দিনে রোযা পালন করবে, আর যার ইচ্ছা হয় তা বর্জন করবে। (সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, পৃ: ৩২৬, হা:নং ২৪৪৩)

উপরোক্ত এ সকল বর্ণনা থেকে এ দিনের মর্যাদা ও ফযীলত সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। আামদের নেককার পূর্বসূরিগণ এ দিনের নফল রোযা গুরুত্বের সাথে পালন করেছেন। তাঁদের অনুকরণে আমাদেরকেও গুরুত্বের সাথে পালন করার চেষ্ঠা করা উচিত।

ইয়াহুদী-নাসারার বিরুদ্ধে এবং এ রোযা পালনে রাসূল (সা) এর সুন্নাহ

আশুরার দিনেই হযরত মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈগণ ফিরআউনের অত্যাচার থেকে নাজাত পেয়েছিলেন। এবং ফিরআউন সম্প্রদায় দরিয়ায় ডুবে ধ্বংস হয়েছিল। এর শুকরিয়া আদায়ার্থে হযরত মূসা (আ) এ দিনটিতে রোযা রেখেছিলেন। তাঁর অনুকরণেই ইয়াহুদী এবং নাসারারা এ দিনে রোযা পালন করতো। মদীনায় আগমনের পর রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত মূসা (আ) এর অনুকরণে এ দিনে রোযা পালন করতেন। তবে যেহেতু এ দিনটিইতে ইয়াহুদী ও নাসারারা পূর্ব থেকেই রোযা পালন করত, তাই রাসূলুল্লাহ (সা) শুধুমাত্র ঐ দিনটিতে রোযা না রেখে তৎসঙ্গে আরো একটি অথবা দুটি রোযা পালন করে ইয়াহুদীদের বিরোধীতার নির্দেশ দেন।

আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীস প্রমাণ স্বরূপ বর্ণনা করা হলো: হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আশুরার দিনে রোযা

রাখলেন এবং আমাদেরকেও রোযা পালনের নির্দেশ দিলেন, তখন সাহাবে কেরামগণ বললেন হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো এমন দিন যে দিনকে ইয়াহুদীও নাসারারা সম্মান দিয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঠিক আছে, আগামী বছর আমরা নবম তারিখেও রোযা রাখব। কিন্তু আগত বছর আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তেকাল ফরমালেন।

এ হাদীসে নবম তারিখে রোযা রাখার অর্থ হলো আশুরার দিনের সংঙ্গে নবম তারিখেও রোযা রাখা। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে: হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা 'আশুরার দিন রোযা পালন কর। অতঃপর এরপর একদিন রোযা পালন কর। (ফাতহুল বারী আহমদের সূত্রে)

কোন ব্যক্তি যদি 'আশুরার' দিনে রোযা পালন করতে চায়, তাহলে সে যেন এর সঙ্গে নবম তারিখে অথবা একাদশ তারিখেও রোযা পালন করে। তবে নবম,দশম, ও একাদশ এ তিন দিন রোযা পালন করা সবচেয়ে বেশি উত্তম।

আলোচ্য হাদীসটির শিক্ষা

- নবী ও রাসূলগণ ভাই ভাই। তাঁরা সকলেই একই দ্বীনের ধারক, বাহক ও প্রচারক ছিলেন।
- পূর্ববর্তী নবীগণও আশুরার রোযা পালন করতেন।
- আশুরার নফল রোযা পালন করলে পূর্ববতী একবছরের গুনাহের কাফফারা হয়।
- পূর্ববর্তী উম্মতের বিজয় পরবর্তীদের জন্যও বিজয় তুল্য।
- ইয়াহুদী ও নাসাদের বিরোধীতার উদ্দেশ্যে মুসলিম উম্মাহ 'আশুরার' আগে বা পরে এক বা একাধিক রোযা পালন করবে।
- নফল রোযা পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা শরী'আত সম্মত।

মহান আল্লাহ তা'আলা ফরজ ইবাদত সম্পাদনের পাশাপাশি নফলের ব্যাপারেও মনোযোগী হওয়ার তাওফীক দান করুন।♦

সাঈদ মুহাম্মদ রিজভি

ইসলামে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা

মূল: সাঈদ মুহাম্মদ রিজভি
অনুবাদ: মুস্তাফা মাসুদ

সাঈদ মুহাম্মদ রিজভির জন্ম ১৯৫৭ সালে, ভারতের বিহার রাজ্যের সিবান জেলার এক ঐতিহ্যবাহী আলেম পরিবারে। হিন্দি, উর্দু ও ইংরেজি ছাড়াও আরবি ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপন্ন; আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি বক্তা। ইসলাম বিষয়ে বক্তৃতার উদ্দেশ্যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রায় সব শহর; অস্ট্রেলিয়া, গায়ানা, ত্রিনিদাদ, যুক্তরাজ্য, দুবাইসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও জরুরি এই লেখাটি রিজভি'র 'Religious Tolerence in Islam' শীর্ষক একটি বক্তৃতা-নিবন্ধের অনুবাদ; ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।– অনুবাদক

মানবাধিকারের প্রশ্নে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পারস্পরিক সম্মানবোধ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, যা অন্যান্য ধর্মের মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে; এটি অবশ্যই ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে। আজ আমি ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা তুলে ধরব।

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের মতো ইসলামও আল্লাহ-প্রেরিত নবী ও রাসূলগণের ওপর বিশ্বাস করে। ধর্মের স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার এক চমকপ্রদ

উপায় হলো নবী-রাসূলগণের ভূমিকার প্রতি নজর দেওয়া। তাঁদেরকে কি শিক্ষা-আদর্শে জোর করে জনগণকে দীক্ষিত করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল? হজরত মূসা (আ), হজরত ঈসা (আ) ও হজরত মুহাম্মদ (সা) কি তরবারির সাহায্যে জনগণের ওপর তাঁদের শিক্ষা-আদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছিলেন? কখনোই নয়! ইসলামের পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন– আল্লাহ প্রেরিত ওহীর বাণীসমূহ, যেখানে তিনি স্পষ্টভাবে নবী-রাসূলগণের কর্তব্যের উল্লেখ করে বলেছেন, ''প্রচার করাই কেবল রাসূলের কর্তব্য। আর তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন কর আল্লাহ তা জানেন।'' [সূরা মায়িদা, আয়াত: ৯৯]

একদা মক্কার লোকেরা মহানবী (সা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করল যে– আল্লাহ যদি তাদের মূর্তিপূজা পছন্দ না করেন, তাহলে কেন তিনি জোরপূর্বক তাদের বাধা দিচ্ছেন না? তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিম্নবর্ণিত আয়াত নাজিল করেন:

''মুশরিকরা বলবে, 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা ও আমরা তাঁকে ব্যতীত অপর কোনো কিছুর 'ইবাদত করতাম না এবং তাঁর অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোনো কিছু নিষিদ্ধ করতাম না।' তাদের পূর্ববর্তীরা এরূপই করত। রাসূলদের কর্তব্য তো শুধু সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেওয়া।'' [সূরা নাহ্‌ল, আয়াত: ৩৫]

সুতরাং কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে– জনগণের ওপর তাঁদের শিক্ষা ও আদর্শাবলি জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া আল্লাহর নবী ও রাসূলগণের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে বোঝানো এবং যাতে তারা স্বেচ্ছায় আল্লাহকে স্বীকার করে নেয়। হজরত মুহাম্মদ (সা)-কে লক্ষ করে আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লা বলেন, ''বলো, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং কোনো ইলাহ্‌ নেই আল্লাহ ব্যতীত, যিনি এক, যিনি প্রবল প্রতাপশালী...'' [সূরা সাদ, আয়াত: ৬৫]

পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে বলছে যে, ধর্ম কারও ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে না। ইরশাদ হচ্ছে: ''দীন সম্পর্কে কোনো জবরদস্তি নেই''; [সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৬] কেন? কারণ, ''সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে।'' [ঐ]

মহানবী (সা)-এর উদাহরণ

ইসলামের নবী হজরত রাসূলে করীম (সা) নিজের জন্মস্থান মক্কায় অনেক অসুবিধা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাধ্য হয়ে মদিনায় হিজরত করতে হয়। কিন্তু সমস্ত বিরোধিতা, এমনকি মক্কায়

অবস্থানকালে তাঁর অনুসারিগণের ওপর শারীরিক নির্যাতন সত্ত্বেও, রাসূলুল্লাহ (সা) অবিশ্বাসীদের প্রতি সব সময় সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন। ইসলাম প্রচারের এক পর্যায়ে তিনি অবিশ্বাসীদের সামনে পবিত্র কুরআনের এই ছোট্ট সূরাটি তেলাওয়াত করে শোনান: ''বলো, 'হে কাফিররা!/ আমি তাঁর 'ইবাদত করি না যার 'ইবাদত তোমরা কর/ এবং তোমরাও তাঁর 'ইবাদতকারী নও যাঁর 'ইবাদত আমি করি।/ এবং আমি 'ইবাদতকারী নই তার যার 'ইবাদত তোমরা করে আসছ।/ এবং তোমরাও তাঁর 'ইবাদতকারী নও যার 'ইবাদত আমি করি,'/ 'তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।''

মহানবী (সা) যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন তিনি দেখতে পান যে, ইসলাম গ্রহণকারিগণের পাশাপাশি সেই নগরে এক বৃহৎ ইহুদি সম্প্রদায় রয়েছে। কিন্তু এতে তিনি বিরক্ত বা চিন্তাগ্রস্ত হননি। তিনি তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য বাধ্য করেননি; তৎপরিবর্তে তিনি তাদের সাথে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং তাদেরকে তিনি 'আহলুল কিতাব'– আসমানি গ্রন্থের অনুসারী হিসেবে আখ্যা দেন। সত্যিই এটি ছিল অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি প্রদর্শিত সহিষ্ণুতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত।

মহানবী (সা) এবং মদিনার ইহুদিদের মধ্যে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি ইহুদি সম্প্রদায়ের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যাপকভাবে নিশ্চিত করেছিল; সেইসাথে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও নিশ্চিত করেছিল; এর ফলে তারাও চুক্তির শর্তগুলো মেনে চলেছিল। সুতরাং আমরা ঐতিহাসিকভাবেও দেখতে পাই যে, ইসলামের নবী (সা) অন্যান্য তৌহিদবাদী ধর্মের অনুসারীদের সাথে– বিশেষ করে ইহুদি ধর্ম ও খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে প্রস্তুত ছিলেন।

এমন কি, রাসূলুল্লাহ (সা) আরবের আশপাশের বিভিন্ন দেশ ও জাতির শাসকদের নিকট যেসব পত্র লেখেন, সেগুলো আমাদের আলোচনার সপক্ষে চমকপ্রদ দলিল। কোনো একটি চিঠিতে রাসূলুল্লাহ (সা) এমন হুমকি দেননি যে, তারা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ না করলে তাদের ওপর সামরিক হামলা চালানো হবে। আবিসিনিয়ার খ্রিষ্টান রাজা নাজ্জাশীর কাছে পাঠানো চিঠির শেষ বাক্যটি ছিল এরকম: ''আমি আপনার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিলাম; এখন এটি গ্রহণ করা-না করা আপনার বিষয়। পুনর্বার বলি, সত্যিকার হিদায়েত গ্রহণকারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক!''

হজরত জয়নুল আবেদীন (র) থেকে প্রাপ্ত একটি দলিল আমাদের কাছে রয়েছে। এই দলিলের শিরোনাম হলো 'রিসালাতু আল-হুকুক, যার অর্থ

'অধিকারসমূহের সনদ'। এই সনদে তিনি সমাজের বিভিন্ন বিষয় ও মানুষদের সাথে সম্পর্কিত নানা অধিকারের উল্লেখ করেছেন। এই সনদের সর্বশেষ অংশে মুসলিম সমাজে অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে: ''তোমাদের দ্বারা তাদের প্রতি কোনোরূপ অবিচার থেকে, আল্লাহ-প্রদত্ত সুরক্ষা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে, এবং তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুতিসমূহের বিষয়ে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই বাধা থাকতে হবে। কারণ, আমরা জানি যে, মহানবী (সা) বলেছেন, ''যে-কেউ একজন সুরক্ষাপ্রাপ্ত অমুসলিমের প্রতি অবিচার করবে, শেষ বিচারের দিন অবশ্যই আমি তার শত্রু হবো।'' ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত 'আলী মিশরে নিযুক্ত তাঁর গভর্নরের উদ্দেশে লেখা এক পত্রে বলেন, ''প্রজাদের প্রতি করুণা এবং তাদের প্রতি স্নেহ ও দয়া প্রদর্শনের জন্য আপনার অন্তরকে সংবেদনশীল করুন। তাদের সামনে লোভী পশুর মতো দাঁড়াবেন না; যাতে তারা যেন মনে না করে যে, তাদেরকে গ্রাস করার জন্য তা-ই যথেষ্ট। কারণ, তারা দুই ধরনের– হয় আপনার ঈমানদার ভাই, অথবা সৃষ্টির মাঝে আপনার মতোই একজন।'' [নাহাজুল বালাগা, পত্র নং-৫৩]

মুসলমানদের ইতিহাস

দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঘটনাবলির পর আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য বিশ্বে এক বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যেখানে ইসলাম সন্ত্রাসের ধর্ম হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে এবং যেখানে মুসলামানেরা ঢালাওভাবে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত। ইতিহাসের বইপুস্তক, বিশেষ করে প্রাচ্যবিদদের দ্বারা লিখিত ইতিহাস গ্রন্থাদি মুসলমানদের এক হাতে কুরআন, অন্য হাতে তরবারি– এভাবে উপস্থাপন করতে পছন্দ করে; এ দ্বারা এই বুঝাচ্ছে– যেখানেই মুসলমানেরা গিয়েছে, সেখানেই তারা বিজিত লোকেদেরকে দুটি বিষয় বেছে নিতে দিয়েছে: ইসলাম অথবা মৃত্যু। তবে, আরও অধিক বিদগ্ধ ইতিহাসবিদগণ মুসলমানদের এই বিকৃত চিত্রকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন। অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই যে, মুসলমানেরা মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ায় অন্যদের ভূখণ্ড জয় করেছে, কিন্তু বিজিতদের ওপর তারা তাদের ধর্ম চাপিয়ে দেয়নি। 'মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সম্প্রসারণ' ও 'ইসলামের বিস্তৃতি'– ইতিহাসে এদুয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়, মুসলমানেরা বহু শতাব্দী যাবত ভারত শাসন করেছেন; কিন্তু বরাবর সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অমুসলিম রয়ে গেছে। ভারত মুসলিম শাসনাধীনে এসেছিল শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, কিন্তু ইসলাম ভারতীয়দের মাঝে শেকড় গেড়েছিল মহান সুফি-সাধকদের দাওয়াতি

কার্যক্রম ও তাঁদের জীবনাদর্শের বাস্তব উদাহরণ দ্বারা। এটি একটি সত্য ঘটনা, যা প্রখ্যাত ভারতীয় লেখক-সাংবাদিক খুশবন্ত সিং-এর লেখা *The History of Sikhs* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সময় আমাকে এ বিষয়ে এর চেয়ে বেশি আলোচনার সুযোগ দিচ্ছে না, তবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সহনশীলতা ও তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতার বিষয়ে কিছু কথা বলতে হয়। আমরা যদি উনিশ শতকের মুসলিম শাসকদের অধীনে বসবাসরত সংখ্যালঘুদের প্রতি তাদের (শাসকদের) আচরণের সাথে ইয়োরোপীয় ও মার্কিন শাসকদের অধীনে বসবাসরত সংখ্যালঘুদের প্রতি তাদের আচরণের তুলনা করি তাহলে আমি সাহসের সাথে বলতে পারি যে, মুসলিম শাসকদের রেকর্ড অধিকতর ভালো হবে।

আমি মনে করি, উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রখ্যাত পশ্চিমা ঐতিহাসিক রোডেরিক এইচ. ডেভিসন-এর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করাই এখানে যথেষ্ট হবে। সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিষ্ণুতার বিষয়ে ডেভিসন লিখছেন: ''বাস্তবিকপক্ষে এই অভিমতটি উপস্থাপন করা যেতে পারে যে, রুশরা পোলিশদের প্রতি, ইংরেজরা আইরিশদের প্রতি অথবা আমেরিকানরা নিগ্রোদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করেছিল, তার চেয়ে তুর্কিরা তাদের বশীভূত লোকদের প্রতি কম অত্যাচারী ছিল– এ বিষয়ে প্রমাণ রয়েছে যে, এই সময়ে (ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে) স্বাধীন গ্রিস থেকে উসমানীয় সাম্রাজ্যে কিছু লোকের অভিবাসন ঘটেছিল; সেসময় কিছু গ্রিক দেখতে পেয়েছিল যে, উসমানীয় সরকার তাদের নিজস্ব গ্রিক সরকারের চেয়ে অধিকতর প্রশ্রয়পূর্ণ।'' [Reform of the Ottoman Empire 1856-1876, New Jersey, Princeton University Press, 1963, p. 116.]♦

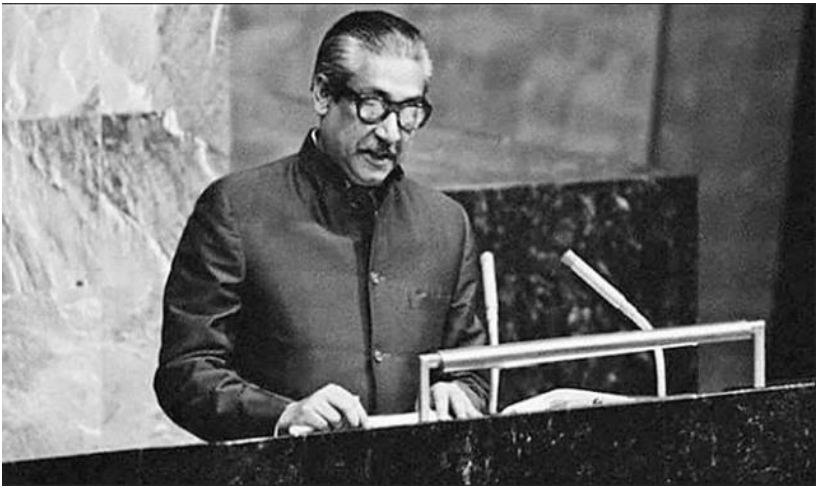

জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বাংলা ভাষণ

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের সেই দিনটি নতুন করে ফিরে দেখা

বাংলা ভাষার নামে এ দেশের নাম বাংলাদেশ। এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাদের উন্মুখ করে তুলেছিলেন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে। তারও আগে যুক্ত হয়েছিলেন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির আন্দোলনে। জাতিসংঘে বাংলায় প্রথম ভাষণ দিয়ে সেই তিনিই বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছিলেন এই ভাষাকে। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের সেই দিনটি নতুন করে ফিরে দেখা।

শেখ মুজিবুর রহমান

জনাব সভাপতি,

আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ আজ এই

পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়া বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বের সকল জাতির সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সাথে শহীদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হইবে। ইহা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার যে স্বাধীনতাযুদ্ধের একজন সক্রিয় যোদ্ধা সভাপতি থাকাকালেই বাংলাদেশকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া হইয়াছে। জনাব সভাপতি, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির শীর্ষসম্মেলনের সাফল্যের ব্যাপারে আপনাদের মূল্যবান অবদানের কথা আমি স্মরণ করিতেছি।

যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্ব-সমাজে স্থান লাভ করিয়াছে, এই সুযোগে আমি তাঁদেরকেও অভিবাদন জানাই। বাংলাদেশের সংগ্রামে সমর্থনদানকারী সকল দেশ ও জনগণের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহতকরণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন ও ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বাংলাদেশকে যাঁহারা মূল্যবান সাহায্য দিতেছেন, তাঁহাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। জাতিসংঘে যাঁহারা আমাদের স্বাগত জানাইয়াছেন, তাঁহাদেরকে আমি বাংলাদেশের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম হইতেছে সার্বিক অর্থে শান্তি এবং ন্যায়ের সংগ্রাম আর সেই জন্যই জন্মলগ্ন হইতেই বাংলাদেশ বিশ্বের নিপীড়িত জনতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আসিতেছে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পরে এই ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, এইসব নীতিমালার বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে কি তীব্র সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইতেছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার লক্ষ লক্ষ বীর যোদ্ধার চরম আত্মদানের মাধ্যমে শুধুমাত্র জাতিসংঘ সনদ স্বীকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পুনরুদ্ধার সম্ভব।

আগ্রাসনের মাধ্যমে বেআইনিভাবে ভূখণ্ড দখল, জনগণের অধিকার হরণের জন্য সেনাবাহিনী ব্যবহার এবং জাতিগত বৈষম্য ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখনো অব্যাহত রহিয়াছে। আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ এবং গিনিবিসাউ এই সংগ্রামে বিরাট বিজয় অর্জন করিয়াছে। চূড়ান্ত বিজয়ে ইতিহাস যে জনগণ ও ন্যায়ের পক্ষেই যায়, এইসব বিজয় এই কথাই প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু বিশ্বের বহু অংশে এখনো অবিচার ও নিপীড়ন চলিতেছে। অবৈধ দখলকৃত ভূখণ্ড পুরাপুরি মুক্ত করার জন্য আমাদের আরব ভাইদের সংগ্রাম অব্যাহত রহিয়াছে এবং প্যালেস্টাইনি জনগণের বৈধ জাতীয় অধিকার এখনো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। উপনিবেশ বিলোপ প্রক্রিয়ার যদিও অগ্রগতি হইয়াছে, কিন্তু এই প্রক্রিয়া এখনো চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছায় নাই, বিশেষ করিয়া আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই সত্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের জিম্বাবুয়ে (দক্ষিণ রোডেশিয়া) এবং নামিবিয়ার জনগণ জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়তার সাথে লড়াই করিয়া যাইতেছে। বর্ণবৈষম্যবাদ, যাহাকে মানবতার বিরোধী বলিয়া বার বার আখ্যায়িত করা হইয়াছে, তাহা এখানে আমাদের বিবেককে দংশন করা অব্যাহত রাখিয়াছে।

একদিকে অতীতের অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটাইতে হইতেছে, অপরদিকে আমরা আগামী দিনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইতেছি। আজিকার দিনে বিশ্বের জাতিসমূহ কোন পথ বাছিয়া নিবে, তাহা লইয়া সংকটে পড়িয়াছে। এই পথ বাছিয়া নেওয়ার বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে আমরা সামগ্রিক ধ্বংসের ভীতি এবং আণবিক যুদ্ধের হুমকি নিয়া এবং ক্ষুধা, বেকারি ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে মানবিক দুর্গতিকে বিপুলভাবে বাড়াইয়া তুলিয়া আগাইয়া যাইব অথবা আমরা এমন এক বিশ্ব গড়িয়া তোলার পথে আগাইয়া যাইব– যে বিশ্বে মানুষের সৃজনশীলতা এবং আমাদের সময়ের বিজ্ঞান ও কারিগরি অগ্রগতি আণবিক যুদ্ধের হুমকিমুক্ত উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের রূপায়ণ সম্ভব করিয়া তুলিবে এবং যে বিশ্ব কারিগরিবিদ্যা ও সম্পদের পারস্পরিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে সুন্দর জীবন গড়িয়া তোলার অবস্থা সৃষ্টি করিবে। যে অর্থনৈতিক উত্তেজনা সম্প্রতি সমগ্র বিশ্বকে নাড়া দিয়াছে, তাহা একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া জরুরিভাবে মোকাবিলা করিতে হইবে। এই বৎসরের প্রথম দিকে এই পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বর্তমান জটিল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশকে মারাত্মকভাবে আঘাত হানিয়াছে। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার উপর সৃষ্ট বাংলাদেশ পরপর কতিপয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছে। আমরা সর্বশেষে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছি, তাহা হইতেছে এই বৎসরের নজিরবিহীন বন্যা। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সাহায্য করার ব্যাপারে সক্রিয় উৎসাহ প্রদর্শন করায় আমরা জাতিসংঘ, তার বিভিন্ন সংস্থা ও মহাসচিবের কাছে কৃতজ্ঞ।

আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদিন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বুতেফ্লিকা বাংলাদেশের সাহায্যে আগাইয়া আসার জন্য জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। মিত্রদেশগুলি এবং বিশ্বের মানবিক সংস্থাসমূহও এ ব্যাপারে সাড়া দিয়াছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিই শুধু ব্যাহত হয় নাই, ইহার ফলে দেশে আজ দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দরুন আমাদের মতো দেশগুলিতে দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে হাজার হাজার ডলার শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে বার্ষিক মাথাপিছু এক শ ডলারেরও কম আয়ের জনগণ বর্তমানে মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। তাহারা বর্তমান স্তরের চাইতেও তাদের জীবনযাত্রার মান কমাইয়া আনিতে বাধ্য হইয়াছে।

বিশ্ব খ্যাদ্য সংস্থার বিবেচনায় শুধুমাত্র বাঁচিয়া থাকার জন্য যে সর্বনিম্ন সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহার চাইতেও কম ভোগ করিয়াছে যেসব মানুষ, তাহারা আজ অনাহারের মুখে পতিত হইয়াছে। দরিদ্র দেশগুলির ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার। শিল্পোন্নত দেশগুলির রপ্তানি পণ্য, খাদ্যসামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্যের দরুন তাহা আজ ক্রমশ তাহাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য তাহাদের প্রচেষ্টাও প্রয়োজনীয় উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতার ফলে প্রচণ্ডভাবে বিঘ্নিত হইতেছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির ফলে ইতিমধ্যেই দারিদ্র্য ও ব্যাপক বেকারির নিষ্পেষণে পতিত দেশগুলি তাহাদের পাঁচ হইতে ছয় শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির হার সংবলিত পরিমিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাঁটাই করার ভয়ানক আশঙ্কার হুমকিতে পতিত হইয়াছে। এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে কেবলমাত্র উন্নয়ন প্রকল্পের খরচই বহুগুণ বাড়িয়া যায় নাই, উপরন্তু তাহাদের নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্য তাহাদের সামর্থ্যও প্রতিকূলভাবে কমিয়া গিয়াছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিশ্বের জাতিসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে না পারিলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আরও চরমে উঠিবে, ইতিহাসে ইহার

প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষের সেই দুঃখ-দুর্দশার আর কোনো পূর্ববর্তী নজির পাওয়া যাইবে না। ইহার পাশাপাশি অবশ্য থাকিবে গুটিকয়েক লোকের অপ্রত্যাশিত সুখ-সমৃদ্ধি। শুধুমাত্র মানবিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়িয়া তোলা এবং পারস্পরিক স্বনির্ভরতার স্বীকৃতি এই পরিস্থিতির যুক্তিযুক্ত সমাধান আনিতে পারে এবং এই মহাবিপর্যয় পরিহার করিবার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

একটি যথার্থ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘকে এর আগে কোথাও এই ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে হয় নাই। এই ধরনের ব্যবস্থায় শুধুমাত্র নিজ নিজ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকারকে নিশ্চিত করাই নয়, ইহাতে একটি স্থায়ী এবং যথার্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য বিশ্বের দেশগুলির সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রণয়নেরও ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। এই মুহূর্তে আমরা প্রত্যেক মানুষের জন্য মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্বীকৃত মুক্তভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে পুনরুল্লেখ করিতেছি। আন্তর্জাতিক ঘোষণা অনুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবারের কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

আমরা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন যে বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট শুধুমাত্র শান্তি এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতার পরিবেশেই সমাধান করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বর্তমান অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করার জরুরি ব্যবস্থা নিতে হইবে। ইহাতে শুধুমাত্র এই ধরনের পরিবেশই সৃষ্টি হইবে না, ইহাতে অস্ত্রসজ্জার জন্য যে বিপুল সম্পদ অপচয় হইতেছে, তাহাও মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করা যাইবে।

বাংলাদেশ প্রথম হইতেই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এই নীতিমালার উপর ভিত্তি করিয়া জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশই কষ্টলব্ধ জাতীয় স্বাধীনতার ফল ভোগ করিতে আমাদেরকে সক্ষম করিয়া তুলিবে এবং সক্ষম করিয়া তুলিবে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা ও বেকারির বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য আমাদের সকল শক্তি ও সম্পদকে সমাবেশ ও কেন্দ্রীভূত করিতে। এই ধারণা হইতে জন্ম নিয়াছে শান্তির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি। এই জন্য সমঝোতার অগ্রগতি, উত্তেজনা প্রশমন, অস্ত্র সীমিতকরণ এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা– বিশ্বের যে কোনো অংশে যে কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হউক না কেন, আমরা তাহাকে স্বাগত জানাই। এই নীতির

প্রতি অবিচল থাকিয়া আমরা ভারত মহাসাগরীয় এলাকা সম্পর্কে শান্তি এলাকার ধারণা, যাহা এই পরিষদ অনুমোদন করিয়াছে, তাহাকে সমর্থন করি।

আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তি, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ এলাকায় পরিণত করার প্রতিও সমর্থন জানাই।

আমরা বিশ্বাস করি যে, সমবেত উন্নয়নশীল দেশসমূহ শান্তির স্বার্থকে দৃঢ় সমর্থন করে। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগুরু জনগণের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন।

মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি অত্যন্ত জরুরি এবং তাহা সমগ্র বিশ্বের নরনারীর গভীর আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটাইবে এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তিই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের অঙ্গীকার প্রমাণের জন্য উপমহাদেশে আপোস মীমাংসার পদ্ধতিকে আমরা জোরদার করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের অভ্যুদয় বস্তুতপক্ষে এই উপমহাদেশে শান্তি কাঠামো এবং স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবদান সৃষ্টি করিবে। ইহা ছাড়া আমাদের জনগণের মঙ্গলের স্বার্থেই অতীতের সংঘর্ষ ও বিরোধিতার পরিবর্তে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আমরা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত ও নেপালের সাথে শুধুমাত্র সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কই প্রতিষ্ঠা করি নাই, অতীতের সমস্ত গ্লানি ভুলিয়া গিয়া পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক করিয়া নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছি। পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য আমরা কোনো উদ্যোগ বাদ দেই নাই এবং সবশেষে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমরা চূড়ান্ত অবদান রাখিয়াছি। ঐ সকল যুদ্ধবন্দী মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে। ইহা হইতেছে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ও উপমহাদেশে ভবিষ্যৎ শান্তি ও স্থায়িত্ব গড়িয়া তোলার পথে আমাদের অবদান। এই কাজ করিতে গিয়া আমরা কোনো পূর্বশর্ত আরোপ অথবা কোনো দরকষাকষি করি নাই। আমরা কেবলমাত্র আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কল্পনায় প্রভাবিত হইয়াছি।

৬৩ হাজার পাকিস্তানি পরিবারের অবস্থা এখনো মানবিক সমস্যারূপে রহিয়া গিয়াছে। তাহারা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছে এবং নিজ দেশে ফিরিবার জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির কাছে নাম তালিকাভুক্ত করিয়াছে। যে দেশের প্রতি তাহারা আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছে, সেই দেশে তাহাদের যাইবার অধিকার আছে। আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারেই এই অধিকার

তাহাদের উপর বর্তাইয়াছে। এই মানবিক সমস্যার অবিলম্বে সমাধান প্রয়োজন। আরও একটি জরুরি সমস্যা হইল, সাবেক পাকিস্তানের পরিসম্পদ বণ্টন। পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত রহিয়াছে। আমরা আশা করি, উপমহাদেশের জনগণের কল্যাণের স্বার্থে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এইসব অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান হইবে, যাহাতে স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া সফল হইতে পারে।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিবেশী সকল দেশের সাথে সৎপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখিবে। আমাদের অঞ্চলে এবং বিশ্বশান্তির অন্বেষার সকল উদ্যোগের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকিবে।

জাতিসংঘ অসুবিধা ও বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহার ২৫ বৎসরের কার্যকালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানবিক অগ্রগতির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছে। এক কথায় বলা যায়, বিরোধ ও মানবিক দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও জাতিসংঘ ভাবীকালের দিকে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সমুজ্জ্বল রাখিয়াছে। বিশ্ব সংস্থার সুনির্দিষ্ট সাফল্য ও সম্ভাবনাময় দিক সম্পর্কে বাংলাদেশ যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছে, এমনটি আর কেউ করে নাই। ড. কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের সম্ভাবনাময় নেতৃত্ব এবং তাঁর নিবেদিত প্রাণ সহকর্মীদের জন্যই বাংলাদেশে যুদ্ধের দাগ মুছিয়া ফেলিতে, যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে এবং ভারত হইতে ফিরিয়া আসা এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসিত করিতে জাতিসংঘ আমাদের দেশে ব্যাপক সাহায্য ও পুনর্গঠন কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছিল। এইসব শরণার্থী মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নিয়াছিল। জাতিসংঘের মহাসচিব, তাঁর সহকর্মী এবং বিভিন্ন মানবিক সংস্থা যাহারা আমাদের দেশে বিরাট কর্মসূচিতে অংশ নিয়াছিল, তাহাদেরকে বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমরা বিশ্বাস করি জাতিসংঘের গঠনমূলক নেতৃত্ব উপমহাদেশের অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানে সহায়ক হইবে। আমি আগেই বলিয়াছি, সাম্প্রতিক বিপর্যয়কারী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে জাতিসংঘের প্রয়াসে আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ বার বার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়িয়াছে। বাংলাদেশ বিশেষ অসুবিধার জন্য এমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই, যাহার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাইয়া আসিতে পারে। জাতিসংঘ দুর্যোগ ত্রাণ সমন্বয় অফিস স্থাপন করিয়াছে। এই ব্যাপারে স্বল্প

হইলেও একটি দৃষ্টান্ত সূচনা করিয়াছে। লক্ষ্য পূরণে উদ্যোগ সমন্বিত করার ব্যাপারে তাই জাতিসংঘের সদস্যদের একটি বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে।

জনাব সভাপতি, মানুষের অজয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস, মানুষের অসম্ভবকে জয় করার ক্ষমতা এবং অজেয়কে জয় করার শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখিয়া আমি আমার বক্তৃতা শেষ করিতে চাই। আমাদের মতো যেইসব দেশ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এই বিশ্বাস তাহাদের দৃঢ়। আমরা দুঃখ ভোগ করিতে পারি কিন্তু মরিব না। টিকিয়া থাকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিতে জনগণের দৃঢ়তাই চরম শক্তি। আমাদের লক্ষ্য স্ব-নির্ভরতা। আমাদের পথ হইতেছে জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও যৌথ প্রচেষ্টা। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্পদ ও প্রযুক্তিবিদ্যার শরিকানা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা হ্রাস করিবে এবং আমাদের কর্মকাণ্ডকেও সহজতর করিবে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নতুন বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটিতেছে। আমাদের নিজেদের শক্তির উপর আমাদের বিশ্বাস রাখিতে হইবে। আর লক্ষ্য পূরণ এবং সুন্দর ভাবীকালের জন্য আমাদের নিজেদেরকে গড়িয়া তুলিবার জন্য জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমেই আমরা আগাইয়া যাইব।

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।♦

সূত্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি, খণ্ড ২, বাংলা একাডেমি, ২০০৮

হোয়াইট হাউজে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু, ডানে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন ও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম হোসেন আলী। ২ অক্টোবর ১৯৭৪।

একটি তৃপ্তিদায়ক মুহূর্ত

জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের স্মৃতিচারণ

ফারুক চৌধুরী

১৯৭৪ সালে আমি লন্ডন হাইকমিশনে ডেপুটি হাইকমিশনার হিসেবে কর্মরত ছিলাম। ওই বছরের জুন মাসে ছুটি কাটাতে ঢাকা আসি। প্রথা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে যেতেই তিনি আমাকে তিনটি দায়িত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার আদেশ দিলেন। প্রথম হলো বার্মায় সমুদ্র সীমারেখা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার জন্য যে দলটি যাচ্ছে, আমি যেন সেই দলের সদস্য হিসেবে রেঙ্গুন যাই। দ্বিতীয়, জুলফিকার আলী ভুট্টোর আসন্ন ঢাকা সফরের সময়ে আমি

যেন বাংলাদেশ দলের সদস্য হিসেবে যোগ দিই এবং তৃতীয় সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বঙ্গবন্ধুর যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে আমি যেন তাঁর সহগামী হই। বললেন, 'আমাদের লোকবল কম, অর্থের স্বল্পতা রয়েছে, অতএব তুমি যখন কাছে রয়েছ, এই কাজগুলো তোমাকে করতে হবে।'

১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁর জাতিসংঘ সাধারণ সভার ভাষণটির কথা মনে পড়ে। তখন বাংলাদেশের তথ্য প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তাহেরউদ্দিন ঠাকুর নামক এক ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে আমার কখনো চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে তিনি ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদের দোসর। কিন্তু তার মাত্র এগারোটি মাস আগে ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যলাভের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায়। আমি তখন লন্ডন থেকে ঢাকা এসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে নিউ ইয়র্ক যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। একদিন তদানীন্তন পররাষ্ট্রসচিব ফখরুদ্দীন আহমদ আমাকে বললেন, জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রণয়নে সেই তথ্য প্রতিমন্ত্রী নাকি অহেতুক আগ্রহ প্রদর্শন করছেন। বাংলা ভাষায় নাকি তাঁর জবর দখল। যেহেতু বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে জাতিসংঘে বাংলা ভাষায়ই তিনি তাঁর ভাষণ প্রদান করবেন, সেই মন্ত্রিপ্রবর নাকি বাংলায় খসড়া একটি ভাষণ বঙ্গবন্ধুর সমীপে ইতিমধ্যে পেশ করেছেন। পরে শুনেছিলাম, বঙ্গবন্ধু তাঁকে দিয়েছিলেন পত্রপাঠ (এই ক্ষেত্রে ভাষণপাঠ!) বিদায়। অতএব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রণীত ভাষণটি নিয়ে একদিন ভোরে পররাষ্ট্রসচিব ফখরুদ্দীন আহমদ আর আমি হাজির হলাম বঙ্গবন্ধুর দপ্তরে। কক্ষে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু পড়ছেন আমাদের প্রদত্ত খসড়া ভাষণটি। এমন সময়ে তাঁর কামরায় প্রবেশ করলেন বাংলাদেশ বিমানের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। মুখ তুলে তাকালেন বঙ্গবন্ধু তাঁর দিকে।

কর্মকর্তা প্রবরের প্রশ্ন, 'স্যার, আপনার নিউ ইয়র্ক যাত্রাকালে বিমানে কী ধরনের খাবার পরিবেশন করব?' কানাডায় ইয়াকুবু গওনের সঙ্গে বাগযুদ্ধে জয়ী শেখ মুজিব এবার বাক্যহারা! আমতা আমতা করেই বললেন, 'আমি কী জানি? ডাল-ভাত-মাছ দিয়ো আরকি। যেকোনো কিছু একটা!' প্রসন্ন কর্মকর্তা নিষ্ক্রান্ত হলেন।

আবার প্রধানমন্ত্রী মনোনিবেশ করলেন খসড়া ভাষণপাঠে। কিছুক্ষণ পরই আবার খুলল দরজা। ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশের উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তা। স্যালুট জানালেন প্রধানমন্ত্রীকে।

'হ্যাঁ বলো, কী ব্যাপার?' ভাষণপাঠে বাধাগ্রস্ত বঙ্গবন্ধুর প্রশ্ন।

পুলিশ কর্মকর্তাটির জিজ্ঞাসা, 'স্যার, আজ বিকেলে দুর্গতদের সাহায্যার্থে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের যে প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তার পাহারায় কারা রইবে? রক্ষীবাহিনী না পুলিশ?'

অবাক বঙ্গবন্ধু আর তাঁর সামনে উপবিষ্ট ফখরুদ্দীন আহমদ আর আমিও।

'এই সিদ্ধান্ত দেওয়ার, আমি ছাড়া এই সরকারের কি আর কেউ নেই?' মর্মাহত প্রধানমন্ত্রীর যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন।

অবস্থা বেসামাল বুঝেই আবার স্যালুট জানিয়ে বিদায় নিলেন কর্মকর্তাটি। বঙ্গবন্ধু আবার মনোনিবেশ করলেন খসড়া ভাষণপাঠে। সেদিন সেখানে বসে প্রশ্ন জেগেছিল মনে, এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? সান্নিধ্যকামী অযোগ্য আমলার বহর, না বঙ্গবন্ধুর উদারতা?

ভাষণপাঠ শেষে প্রধানমন্ত্রী তাকালেন আমাদের দিকে। বললেন, 'ভালোই তো তোমাদের ফরেন অফিসের বক্তৃতা। কিন্তু আসল কথাই যে লেখোনি। দেশে দুর্ভিক্ষ হতে যাচ্ছে, সেই কথাটিই তো আমি জাতিসংঘে "বলবার চাই"। বাংলাদেশের সমস্যার কথা বিশ্ববাসী আমার মুখ থেকেই শুনুক। তোমাদের সংশয় কেন?'

ডাক পড়ল সাঁটলিপিকার রোজারিওর। আমাকে অদূরের সোফা দেখিয়ে বললেন বঙ্গবন্ধু, 'ওখানে বসে আসন্ন খাদ্যাভাব সম্বন্ধে একটি লাইন তুমি আমার বক্তৃতায় জুড়ে দাও।' তখনই বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতায় সন্নিবেশিত হলো নিম্নোক্ত কথাগুলো। 'প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাংলাদেশের অগ্রগতি শুধু প্রতিহত করেনি, দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।' বঙ্গবন্ধু ভাষণের আরও একটি অংশের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা শান্তিকামী বলে এই উপমহাদেশে আমরা আপস-মীমাংসানীতির অনুসারী। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের অভ্যুদয় উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছে এবং অতীতের সংঘাত ও বিরোধের বদলে আমাদের তিনটি দেশের জনগণের মধ্যে কল্যাণকর সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। আমরা আমাদের নিকট প্রতিবেশী ভারত, বার্মা ও নেপালের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছি। অতীত থেকে মুখ ফিরিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টায়ও লিপ্ত রয়েছি।' বঙ্গবন্ধু ছিলেন আঞ্চলিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী। তাঁর জাতিসংঘের ভাষণের এই অংশটি ছিল ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি আঞ্চলিক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে কলকাতায় তাঁর বক্তৃতারই প্রতিধ্বনি।

আমরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে নিউ ইয়র্ক পৌঁছালাম ২৩ সেপ্টেম্বর। বঙ্গবন্ধু ২৫ সেপ্টেম্বর তাঁর ভাষণ প্রদান করবেন। যেহেতু বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ইংরেজি তরজমাটি আমাকেই পড়তে হবে, ২৪ সেপ্টেম্বর ভোরেই ছুটে গেলাম জাতিসংঘ ভবনে তাৎক্ষণিকভাবে ইংরেজি তরজমাটি বলার কারিগরি দিকটা রপ্ত করার জন্য। জাতিসংঘের কর্মীরা আমাকে দেখিয়ে দিলেন, দোভাষীর 'বুথে' বসে কীভাবে তরজমাটি তাৎক্ষণিকভাবে পড়ে যেতে হয়। বুকের সাহস কিছুটা বাড়ল। তারপর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর কামরায় দরজা বন্ধ করে রিহার্সেল। তিনি বাংলায় তাঁর ভাষণ পড়ছেন এবং তাঁর সঙ্গে গতি বজায় রেখে বিড় বিড় করে আমিও ইংরেজি তরজমাটি বার দুয়েক পড়লাম। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'যেহেতু তোমার ইংরেজি তরজমাটিই বেশির ভাগ মানুষ শুনবে, তুমি মনে করবে তুমিই প্রধানমন্ত্রী।' তারপর তাঁর চোখ টিপে সেই হাসি। বললেন, 'অবশ্য কেবল বক্তৃতা যতক্ষণ চলবে ততক্ষণের জন্য!' আমার মনে পড়ে, ভাষণ শেষে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখায় তিনি বলেছিলেন, 'তুমি নাকি ভালো বক্তৃতা করেছ!' তারপর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'শাবাশ'। আমার কূটনীতিক কর্মজীবনে তা ছিল একটি অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক মুহূর্ত।♦

সূত্র: জীবনের বালুকাবেলায়, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪
ফারুক চৌধুরী: প্রয়াত পররাষ্ট্র সচিব

শু | ভ | জ | ন্ম | দি | ন

২৮ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভ জন্মদিন

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার পথ-পরিক্রমায় শেখ হাসিনা

শামস সাইদ

১৭ মে, ১৯৮১ সাল। ছয় বছরের নির্বাসিত জীবন শেষে দেশের মাটিতে পা রাখলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। ঢাকার আকাশ মেঘের দখলে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রকৃতি। কালবৈশাখীর হাওয়া বইছে ৬৫ মাইল গতিতে। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি আর দুর্যোগও গতিরোধ করতে পারেনি গণতন্ত্রকামী লাখ মানুষের মিছিল। গ্রাম-গঞ্জ-শহর-নগর-বন্দর থেকে ছুটে এসেছেন অধিকারবঞ্চিত মুক্তিপাগল জনতা। অপেক্ষা করছেন কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে। বঙ্গবন্ধুর রক্তের

উত্তরাধিকারী শেখ হাসিনাকে বরণ করবেন। বিকাল ৪টা, কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে নামল ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের ৭৩৭ বোয়িং বিমান। জনসমুদ্রের জোয়ারের সামনে দাঁড়ালেন শেখ হাসিনা।

স্বাধীনতার অমর স্লোগান 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে প্রকম্পিত ঢাকার আকাশ-বাতাস। জনতার কণ্ঠে বজ্র নিনাদে ঘোষিত হচ্ছে 'হাসিনা তোমায় কথা দিলাম-পিতৃ হত্যার বদলা নেব'। সেদিন অবিরাম মুষলধারে বারি-বর্ষণে যেন ধুয়ে-মুছে যাচ্ছিল বাংলার মাটিতে পিতা হত্যার জমাট বাঁধা পাপ আর কলঙ্কের চিহ্ন। ঢাকা রূপ নিল মিছিলের শহরে। প্রকম্পিত হয়ে উঠল স্লোগানে স্লোগানে।

মানিক মিয়া এভিনিউতে সাজানো হয়েছে শেখ হাসিনার সংবর্ধনা মঞ্চ। বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নেত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী মঞ্চে শেখ হাসিনাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হলো। শেখ হাসিনা দাঁড়ালেন বাংলার মানুষের সামনে। স্মৃতির বেদনায় ভেঙে পড়লেন কান্নায়।

সভা শেষে পিতা-মাতাহীন ৩২ নম্বরের শোকগাঁথা বাড়িতে ফিরতে চাইলেন শেখ হাসিনা। শাসক দলের বাধার কারণে যেতে পারলেন না। ১২ দিন পর সামরিক সরকার প্রধান জেনারেল জিয়া সেনাবাহিনীর কিছু অফিসারের হাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে নিহত হলেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার ১২ জুন খুলে দিলেন ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ি। ছয় বছর পরে স্বজন হারা সেই বাড়িতে ঢুকলেন শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা দেশে ফিরেছিলেন একটা স্বপ্ন নিয়ে। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও পিতার স্বপ্নের বাংলা গড়া। জিয়াউর রহমান নিহত হলেও গণতন্ত্র অবরুদ্ধই রয়ে গেল। নতুন করে জারি হলো সামরিক শাসন। তিন মাসেরও কম সময় প্রেসিডেন্ট সাত্তারকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করলেন এরশাদ। সংসদ ভেঙে দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। শেখ হাসিনা থেমে যাননি। গণতন্ত্র উদ্ধারের শপথ নিয়ে দীর্ঘ নয় বছর ছুটলেন রাজ পথ থেকে বাংলার গ্রামাঞ্চলে।

নয় বছর রাজপথে গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলন করেছেন শেখ হাসিনা। এরশাদের পতনের পরে বাংলাদেশ প্রবেশ করল গণতন্ত্রের এক নতুন অধ্যায়ে।

গণতন্ত্র উদ্ধারের এই যাত্রাপথে বেশ কয়েকবার করাবরণ করতে হয়েছে শেখ হাসিনাকে। সর্বশেষ ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই সকাল ৭:৩১-এ যৌথ

বাহিনী শেখ হাসিনাকে তার বাসভবন "সুধা সদন" থেকে গ্রেফতার করে। আদালত তার জামিন আবেদন না-মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

১৯ বার শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। তাকে হত্যা করতে পারলে শুধু গণতন্ত্র হত্যা না পুরো বাংলাদেশ দখল করেও ভিন্ন পথে পারিচালিত করতে পারত। ২১ আগস্ট সেরকম এক আয়োজন ছিল শেখ হাসিনাকে হত্যা করার। ১৫ ও ২১ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্য অভিন্ন ও সুনির্দিষ্ট। ১৫ আগস্টের কুশীলবেরা কেবল বঙ্গবন্ধুকে নয়, তাঁর রাজনৈতিক আদর্শও হত্যা করতে চেয়েছিল। কারণ তারা জানত, বঙ্গবন্ধু এক অদম্য ও অপ্রতিরোধ্য সর্বজনীন চেতনার শারীরিক প্রতিমূর্তি হিসেবে নিজেকে আসীন করেছিলেন। তাঁকে না সরালে পাকিস্তানি ভাবধারায় রাজনীতি বাংলাদেশে নির্মাণ অসম্ভব। ২১ আগস্টের হত্যাকাণ্ডেও ১৫ আগস্টের আদর্শিক কুশীলবরা জড়িত।

১৫ ও ২১ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে তিনটি স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। প্রথমত, ১৫ আগস্ট কেবল বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে টার্গেট করা হয়েছিল; অপরপক্ষে ২১ আগস্ট টার্গেটে ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ হাসিনাসহ দলের উচ্চ পর্যায়ের সকল নেতা। দ্বিতীয়ত, আপাতদৃষ্টে ১৫ আগস্টের অপারেশন পরিচালিত হয়েছিল শৃঙ্খলিত বাহিনীর কিছু বিপথগামী সেনা কর্মকর্তা দ্বারা, কিন্তু ২১ আগস্টের অপারেশনে ছিল তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের শক্তিশালী একটি অংশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিকভাবে সমর্থিত ও নির্দেশিত থার্ড পার্টি জঙ্গি-গোষ্ঠী। তৃতীয়ত, ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়; আর ২১ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সময় জোট সরকার ক্ষমতায় ছিল।

২১ আগস্টের মূল উদ্দেশ্য সফল হলে আজকের বাংলাদেশ কোন জায়গায় থাকত সে প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন প্যারামিটারে চিত্রায়িত হতে পারে। বিএনপির বলিষ্ঠ একটি অংশ শেখ হাসিনাবিহীন দুর্বল আওয়ামী লীগকে খেলার মাঠে রেখে রাজনৈতিক খেলাটি খেলতে চেয়েছিল। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে পাকিস্তানি ভাবধারা এবং উগ্র-বান্ধব রাজনীতি দু'দশকের জন্য যেমন ব্রেক-থ্রু পেয়েছিল, ঠিক একই ধরনের আরেকটি পাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই থার্ড-পার্টি জঙ্গি-গোষ্ঠীকে ২১ আগস্টের বোমা হামলায় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সমর্থন দেয় তারা।

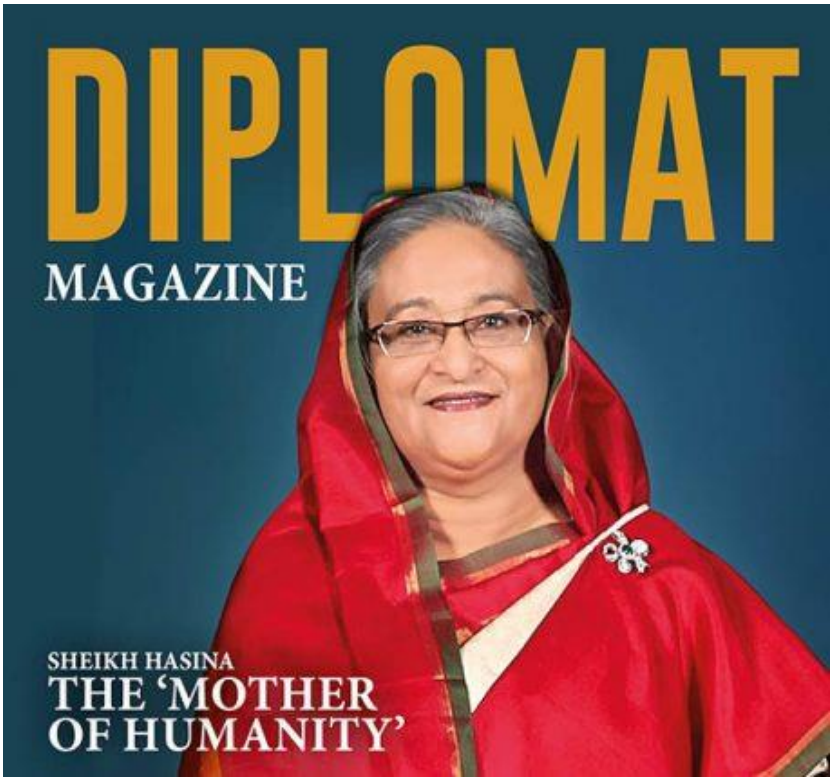

আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন 'ডিপ্লোমেট'-এ শেখ হাসিনাকে নিয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন
'দি মাদার অব হিউম্যানিটি'

হত্যা কিংবা জেলের ভয়ে পিছু হটেননি শেখ হাসিনা। বিপুল জনসংখ্যার এদেশ দীর্ঘকাল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাইরে ছিল। বহু সমস্যা পুঞ্জিভূত হয়ে পাহাড়-সমান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বৈশ্বিক বৈরি অর্থনৈতিক অবস্থাও উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল বার বার। সেই প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অদম্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন শেখ হাসিনা। নিজেকে নিয়োজিত করলেন সোনার বাংলা গড়ার সেনাপতি হিসেবে। বাংলাদেশের মানুষ খুঁজে পেল নতুন পথের দিশা।

নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের পাশে মায়ের মমতা স্নেহ-ভালবাসা নিয়ে দাঁড়ান শেখ হাসিনা। সারা জীবন স্রোতের বিপরীতে হেঁটে আজ বিশ্বমায়ের আসনে অধিষ্ঠিত। বাঙালীর অহঙ্কার দেশরত্ন শেখ হাসিনা। বঙ্গকন্যা থেকে বঙ্গজননী। ধরিত্রীর আদরের কন্যা থেকে মানবতার জননী- মাদার অব হিউম্যানিটি।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্রোতকে বাধা না দিয়ে বাংলাদেশের ভূমিতে ঢুকতে দেয়া, এই প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, 'ওরাও মানুষ- দে আর অলসো হিউম্যান বিইং।' 'আমরা ১৬ কোটি মানুষ যখন খেয়ে-পরে বেঁচে থাকছি, তখন ১০ লাখ রোহিঙ্গাকেও (অসহায়) খাওয়াতে পারব।' 'প্রয়োজনে খাবার ভাগ করে খাব, তবু মানবতার অবমাননা হতে দেব না।' একজন মনীষী বলেছেন, 'মানবতাবাদী হতে হলে ধনী দেশ হওয়ার প্রয়োজন নেই।' শেখ হাসিনা সেটা প্রমাণ করলেন।

শেখ হাসিনা শুধু জাতীয় নেতা নন, বিশ্ব নেতাও বটে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে ক্রমেই তিনি নিয়ে যাচ্ছেন অনন্য উচ্চতায় এবং বিশ্বে তিনি নন্দিতও হচ্ছেন সেভাবে। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছেন তাঁর নানামুখী দূরদর্শী কর্মকাণ্ডের কারণে এবং বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

শেখ হাসিনার রাজনীতিতে আসা একটা স্বপ্ন কিংবা ট্রাজেডির মধ্য দিয়ে। এভাবে রাজনীতিতে আসতে চাননি তিনি। তাকে বাধ্য করেছে সময়। বাংলার মানুষের চাহিদা হোক আর বাবার স্বপ্ন পূরণ যেটাই হোক এর মধ্য দিয়েই তার রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ। ১৯৮১ সালে সর্বসম্মতিক্রমে শেখ হাসিনাকে তার অনুপস্থিতিতেই আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এরপর থেকে শুরু হয় তার রাজনৈতিক লড়াই।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৪৬ টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে। এই সময় ব্যাপক উন্নয়মূলক কর্মকাণ্ডে হাত দেন শেখ হাসিনা। যমুনা সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। প্রথম মুঠোফোন (মোবাইল) প্রযুক্তির বাজার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং উল্লেখযোগ্য হারে কর সুবিধা প্রদান করা হয়। বেসরকারি খাতে টেলিভিশন চ্যানেল অপারেট করার অনুমতি প্রদান করে আকাশ সংস্কৃতিকে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। পিতার সাথে মাতার নাম লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়। কম্পিউটার আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাসকরণের দ্বারা সাধারণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগ অবারিত করে দেওয়া হয়।

১৯৯৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৪২ লাখ ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ২ কোটি ১০ লাখ মানুষকে প্রায় ৯ মাস বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কৃষিঋণ আদায় এক বছর বন্ধ ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে হায়দ্রাবাদ হাউজে মোঘল ডাইনিং হলে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও প্রত্যাশিত চুক্তি সাক্ষরিত হয়।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৬৪টি আসন লাভ করে। আবার সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ।

শেখ হাসিনা শুরু করেন তার সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়া। ২০১২ সালের ১৪ মার্চ মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত মামলায় আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ইটলসের রায়ে বঙ্গোপসাগরে ১ লাখ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটারের বেশি সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০১৩ সালের ১৮ আগস্ট গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে দেশি পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক সহায়তায় বিজ্ঞানী মাকছুদুল আলমের নেতৃত্বে একদল গবেষকের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয় যুগান্তকারী এ সফলতা। ২০১৩ সালের ২ অক্টোবর পাবনার ঈশ্বরদীতে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর দূরত্ব কমাতে পদ্মা নদীর ওপর সেতু তৈরির স্বপ্ন দীর্ঘদিনের। দেশের সব রাষ্ট্রনায়ক ও সরকার প্রধান এ স্বপ্নপূরণের উপায় খুঁজেছেন কিন্তু, সফল হতে পারেননি। ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের ইশতেহারে পদ্মা সেতু নির্মাণের বিষয়টি উল্লেখ করেছিল আওয়ামী লীগ।

পদ্মাসেতুর অগ্রগতি সাধনে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে শেখ হাসিনাকে। দেশি-বিদেশি চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কারণে বিশ্বব্যাংকসহ দাতা সংস্থাগুলো এই প্রকল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বব্যাংক পদ্মাসেতুর অর্থায়ন স্থগিত করে। ২০১২ সালের ২৯ জুলাই আনুষ্ঠানিক ভাবে ঋণচুক্তি বাতিল করে। এতকিছুর পরও টলানো যায়নি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। নিজের সংকল্পে অটল থাকেন তিনি। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে বাজেটেও সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা শুরু হয়। ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর মূল সেতুর কার্যক্রম শুরু হয় নিজেদের অর্থায়নেই।

অবশেষে শেখ হাসিনার অদম্য আত্মবিশ্বাসের কাছে হার মেনেছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ষড়যন্ত্র। কোনও কিছুই স্বপ্নের পদ্মাসেতুর কাজ থামাতে পারেনি। পদ্মাসেতু এখন আর স্বপ্ন নয়। পদ্মার বুকে দাঁড়িয়েছে মাথা উঁচু করে।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ।

২৩ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের বালিয়াড়ি আর ঝাউবীথির বুক চিরে গড়ে তোলা শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২০১৫ সালের ৭ মে ভারতে লোকসভায় পাশকৃত সীমান্তচুক্তি বিল অনুযায়ী ২০১৬ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশের ভেতরে থাকা ভারতের ১১১টি ছিটমহল এবং ভারতে থাকা বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল বিনিময় করা হয় দেশরত্ন শেখ হাসিনার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায়। এত শান্তিপূর্ণ উপায়ে দু'টি দেশের মধ্যে এতগুলো ছিটমহল বিনিময়ের নজির বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই।

স্বল্পোন্নত দেশ এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে বাংলাদেশের। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি কমিটি সিডিপি গত পনের মার্চ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়।

রূপকল্প দু হাজার একুশ বাস্তবায়নের এটি একটি বড় অর্জন। সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছেন।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আটটি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা, শিশু মৃত্যুহার কমানো এবং দারিদ্র হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মন্তব্য। 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেবার মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের। বিশেষত শিক্ষা সুবিধা, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার ও জন্মহার কমানো, গরিব মানুষের জন্য শৌচাগার ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান এবং শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম অন্যতম।

শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা।

প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত প্রতি বছর দুই কোটি তিন লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীকে বৃত্তি, উপ বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। দুই হাজার দশ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হচ্ছে। আমরা এ পর্যন্ত ছাব্বিশ হাজার একশো তিরানব্বইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ছয়শো পয়ষট্টি টি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণ করেছে। দুই হাজার নয় থেকে এ পর্যন্ত চার হাজার ছয়শো একষট্টি টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার হার তিয়াত্তর শতাংশ অতিক্রম করেছে। শিক্ষা সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, দুই হাজার বারো প্রণয়ন করা হয়েছে, গঠন করা হয়েছে 'শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট।'

শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ হিসেবে তার স্থান করে নিয়েছে।

'জাতীয় শিশু নীতি- দুই হাজার এগারো' প্রণয়নের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে শিশুদের সার্বিক অধিকার। দেশের চল্লিশটি জেলার সদর হাসপাতাল এবং বিশটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপন করা হয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল।

দুঃস্থ, এতিম, অসহায় পথ শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্থাপন করা হয়েছে পনেরটি শিশু বিকাশ কেন্দ্র।

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ।

কৃষিখাতে অভূতপূর্ব কিছু সাফল্যের জন্য বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ বারবার আলোচিত হয়েছে। ষোল কোটি জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মেট্রিক টন।

উনিশশো আটাশি সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যোগদানের পর এ পর্যন্ত বিশ্বের উনচল্লিশটি দেশের চোষট্টিটি শান্তি মিশনে খ্যাতি ও সফলতার সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ যাবৎকালে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী একশো পনেরটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বাগ্রে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের পাশাপাশি প্রসার ঘটেছে আবাসন, জাহাজ, ওষুধ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য শিল্পের।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাংলাদেশের অর্জন হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি বিস্তৃত করতে বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃকালীন ভাতাসহ ভাতার হার ও আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করতে পঞ্চান্নটি জেলায় বিদ্যমান মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

পাতালরেল নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজও দ্রুত এগিয়ে চলছে। চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তলদেশ দিয়ে প্রথম টানেল নির্মাণ করা হচ্ছে।

ঢাকা চট্টগ্রাম, ঢাকা ময়মনসিংহ, ঢাকা চন্দ্রা মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার পর চন্দ্রা বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব স্টেশন, বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম স্টেশন রংপুর এবং ঢাকা সিলেট মহাসড়ক চারলেনে উন্নীত করার কাজ চলছে।

নূতন রেলপথ নির্মাণ, নতুন কোচ ও ইঞ্জিন সংযুক্তি, ই টিকেটিং এবং নূতন নূতন ট্রেন চালুর ফলে রেলপথ যোগাযোগে নব দিগন্তের সূচনা হয়েছে। দুই হাজার নয় থেকে এ পর্যন্ত চারশো এক কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে। একশো বাইশটি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। পদ্মা সেতু উদ্বোধনের দিন থেকেই সেতুর উপর দিয়ে শুরু হবে রেল চলাচল। দেশের সকল জেলাকে রেল যোগাযোগের আওতায় আনা হচ্ছে।

বিমান বহরে ছয়টি নতুন ড্রিম লাইনার যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বর্তমানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নিজস্ব উড়োজাহাজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আঠারো'তে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

পঁচানব্বই শতাংশ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে গেছে। সাতানব্বই ভাগ মানুষ উন্নত স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় এসেছে। টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য রামপাল, মাতারবাড়ি, পায়রা ও মহেশখালিতে মেগা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মহেশখালিতে এলএনজি টার্মিনাল থেকে দৈনিক ছয়শো পঞ্চাশ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে।

তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বারো হাজার সাতশো উনআশি টি কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলা হয়েছে। তিনশো বারটি উপজেলা হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে পঞ্চাশ শয্যায়। স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন বারোটি মেডিকেল কলেজ, নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সাতচল্লিশ হাজারেও বেশি জনশক্তি।

উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে সুযোগ সুবিধা। স্থাপন করা হয়েছে হৃদরোগ, কিডনি, ক্যানসার, নিউরো, চক্ষু, বার্ন, নাক কান গলাসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত ইনসটিটিউট

ও হাসপাতাল। অব্যাহত নার্সের চাহিদা মেটাতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নার্সিং ইনস্টিটিউট। বিগত এগারো বছরে বিশ হাজার একশো দুই জন নতুন চিকিৎসক এবং লক্ষাধিক নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি করে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের কাজ চলছে।

খাদ্যশস্য, মাছ এবং মাংস উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। চাল উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান চতুর্থ এবং মাছ ও সবজি উৎপাদনে তৃতীয়।

মেগাসিটি ঢাকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে তীব্রগতিতে ছুটে চলবে দেশের প্রথম মেট্রোরেল- সেদিন আর বেশি দূরে নয়। সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে কাজ চলছে মেট্রোরেল প্রকল্পের। ইতিমধ্যে মেট্রোরেলের ভায়াডাক্ট বসানো হয়েছে ৯ কিলোমিটার আর রেললাইন বসানোর কাজও এগিয়ে গেছে ৩ কিলোমিটার।

কেউ যাতে গৃহহীন না থাকে সেজন্য একাধিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে সরকার। জমি আছে ঘর নেই এমন পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ভূমিহীন, নদীভাঙনে উদ্বাস্তুদের জন্যও ঘর নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে। চৌদ্দ হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একতলা পাকা বাড়ি নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। জন্মের ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের সফলতা দেখিয়েছে বাংলাদেশ।

মন্দার প্রকোপে বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন বিপর্যস্ত বাংলাদেশ তখন বিভিন্ন উপযুক্ত প্রণোদনা প্যাকেজ ও নীতি সহায়তার মাধ্যমে মন্দা মোকাবেলায় সক্ষমই শুধু হয়নি, জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ছয় বেশি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথ ধারার বিপরীতে আমদানি রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে রেমিট্যান্সের পরিমাণ। ঋণ পরিশোধে সক্ষমতার মানদণ্ডে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সমকক্ষতা অর্জিত হয়েছে।

ডিজিটাল অর্থনীতিতে চমকপ্রদ অগ্রগতি অর্জন করে হুয়াওয়ের গ্লোবাল কানেক্টিভিটি ইনডেক্স দুই হাজার উনিশ এর টপ মুভার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ। তালিকায় থাকা বাকি তিন দেশ হচ্ছে ইউক্রেন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আলজেরিয়া।

আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বে একটি সুপরিচিত নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বাংলাদেশ। জিডিপি প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার অর্জনের পাশাপাশি নানা

সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষার হার ও গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ তার দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশীদেরই শুধু নয়, অনেক উন্নত দেশকেও ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি দেশের একটি বাংলাদেশ। এইচবিএসসি'র প্রক্ষেপণ অনুযায়ী দুই হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ছাব্বিশতম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে।

'ডেল্টা প্ল্যান' শত বছরের মহাপরিকল্পনার অধীনে ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য ৮০টি প্রকল্প নেবে সরকার, যাতে ব্যয় হবে প্রায় ২৯৭৮ বিলিয়ন টাকা। এত লম্বা সময়ের পরিকল্পনা বাংলাদেশে এটাই প্রথম। প্রথম পর্যায়ে ছয়টি 'হটস্পট' ঠিক করে এই ৮০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এর মধ্যে ৬৫টি প্রকল্প ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত এবং ১৫টি প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণা সংক্রান্ত।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে অভূতপূর্ব গতিশীলতা সঞ্চালনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও আধুনিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা। জাতির পিতা যেভাবে সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন; বঙ্গবন্ধুকন্যার সুদৃঢ় নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ থেকে বাংলাদেশ আজ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের পরম সৌভাগ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো ভিশনারি কর্মঠ ও প্রচণ্ড সৎ ও বিরল একজন নেতা পেয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের বা উন্নয়নশীল দেশে কিভাবে দ্রুত এগিয়ে নেয়া সম্ভব, শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব সে স্বাক্ষ্য বহন করে। দেশের প্রধানমন্ত্রী সৎ ও আন্তরিক হলে যেকোনো দেশের উন্নয়ন সম্ভব, তার জ্বলন্ত প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বারবার একটি কথাই তিনি বলে থাকেন, জাতির পিতা আমাদের মাথা নত না করতে শিখিয়েছেন। আমরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করেছি, তাই কোনো বিজয়ী জাতি কখনো মাথা নত করে থাকতে পারে না। সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করব। এই মন্ত্রই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার পথে চলতে শক্তি যোগাচ্ছে।♦

বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষ

বঙ্গবন্ধু-নজরুলের জীবনচেতনা ও রাষ্ট্রচিন্তার ঐক্য

প্রত্যয় জসীম

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাঝে মিল আছে অনেক। জাতীয় কবি নজরুল ছিলেন স্বাধীন বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা অন্যদিকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন স্বাধীন বাংলার বাস্তবস্রষ্টা। স্বাধীন বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের নির্মাতা হলেন বঙ্গবন্ধু। নজরুল ও বঙ্গবন্ধু দু'জনেই ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী, সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী।

নজরুল বাঙালি মুসলমানের হাজার বছরের মনের বাঁধন ছিন্ন করেছিলেন আর বঙ্গবন্ধু বাঙালির হাজার বছরের পরাধীনতার যে শিকল তা ছিন্ন করেছিলেন। নজরুল ও বঙ্গবন্ধু উভয়েই কবি। একজন কবিতার অন্যজন রাজনীতির। নজরুল ও বঙ্গবন্ধু দু'জনেই মনে প্রাণে বাংলা ও বাঙালির মুক্তি ও জয় চেয়েছিলেন।

নজরুলের 'বাঙালির জয়' আর বঙ্গবন্ধুর 'জয় বাংলা' এক ও অভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত। দু'জনেই বাঙালির হাজার বছরের সেরা প্রতিভাবান ও প্রতিবাদী দ্রোহী পুরুষ। দু'জনেই বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রতিভূ। নজরুল ও বঙ্গবন্ধু এটি আলোচনার বিষয় হিসেবে পরস্পর প্রবিষ্ট। কেননা নজরুল সাহিত্যের বাইরেও রাজনীতির সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন। আর বঙ্গবন্ধু ছিলেন অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগী আমৃত্যু কল্যাণকামী রাজনীতির নন্দিত নায়ক। নজরুল ও বঙ্গবন্ধু তুলনামূলক সাহিত্যালোচনার বিষয় নয় বলে আমরা মনে করি। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ২৪ মে বঙ্গবন্ধুর একান্ত ইচ্ছা উদ্যোগ ও তৎপরতায় বাংলাদেশে বিদ্রোহী কবিকে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়। এটি ছিল এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। সে সময় কবিকে এদেশে না আনলে হয়তো তাঁকে আর বাংলাদেশে আনা যেতো না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রখর দূরদৃষ্টি এ ঘটনাতেই প্রমাণিত। বঙ্গবন্ধু নজরুলকে নিয়ে লিখেছিলেন, এখানে তার কিয়দংশ সংযুক্ত করা হলো। ১৯৭২ সালের স্বাধীন বাংলার পবিত্র মাটিতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষে নজরুল একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত নজরুল-উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের জন্য একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক কবি তালিম হোসেন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে বাণী প্রদান করেছিলেন, তার সংক্ষেপিত ভাষ্য।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বাণীতে বলেন,

'নজরুল বাঙালির স্বাধীন সত্তার ঐতিহাসিক রূপকার।

নজরুল বাংলার বিদ্রোহী আত্মা ও বাঙালির স্বাধীন ঐতিহাসিক সত্তার রূপকার। বাংলার শেষ রাতের ঘনান্ধকারে নিশীথ নিশ্চিত নিদ্রায় বিপ্লবের রক্তনালীর মধ্যে বাংলার তরুণরা শুনেছে রুদ্র বিধাতার অট্টহাসি কালভৈরবের ভয়াল গর্জন-নজরুলের জীবনে, কাব্যে, সংগীতে, নজরুলের কণ্ঠে। প্রচন্ড-সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো, লেলিহান অগ্নিশিখার মত, পরাধীন জাতির তিমির ঘন অন্ধকারে বিশ্ববিধাতা নজরুলকে এক স্বতন্ত্র ছাঁচে গড়ে পাঠিয়েছিলেন এই ধরার ধুলায়।

সাহিত্যে সম্মানের সুউচ্চ শিখরে নজরুলকে পথ করে উঠতে হয়নি, পথ তাঁকে হাত ধরে ঊর্ধ্বে তুলেছে। মহা অভ্যাগতের মত তাঁর আগমন নন্দিত হয়েছে। সে এসেছে ঝড়ের মাতম তুলে, বিজয়ীর বেশে। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নন্দিত হয়েছিল:

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু,
আধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু,
দু'দিনের এই দুর্গ-শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন
অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ-চেতন।

সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে নজরুলের অগ্নি-মন্ত্র বাঙালি জাতির চিত্তে জাগিয়েছিল মরণজয়ী প্রেরণা-আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার সুকঠিন সংকল্প। শুধু বিদ্রোহ ও সংগ্রামের ক্ষেত্রেই নয়, শান্তি ও প্রেমের নিকুঞ্জেও কবি বাংলার অমৃতকণ্ঠ বুলবুল। দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষার এই বিস্ময়কর প্রতিভার অবদান সম্বন্ধে তেমন কোন আলোচনাই হলো না। বাংলার নিভৃত অঞ্চলে কবির বিস্মৃত-প্রায় যে সব অমূল্য রত্ন ছড়িয়ে আছে তার পুনরুদ্ধারের যে কোন প্রচেষ্টাই প্রশংসার যোগ্য। মনে রাখতে হবে বিদ্রোহী কবির এমন এক সময়ে আবির্ভাব, যখন মধ্যাহ্ন...মার্ত্তরের মত বাংলা সাহিত্যে ও কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ী প্রতিভা সমস্ত দিক, সমগ্র আকাশ, সমস্ত সাহিত্য-চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করেছিল। কাব্যের অনুভূতির, চেতনার, ছন্দের, সুরের, প্রকাশের, যে পথ দৃষ্টিতে পড়ে, সে পথের মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে মেঘেতে মাথা ঠেকিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু নজরুল কাব্যের অনন্য সাধারণ স্বাতন্ত্র্য হলো তাঁর কাব্যের স্বকীয়তা আপন মহিমায় ভাস্বর। বৈপ্লবিক কাব্য-জগতে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন স্বতন্ত্র একক একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তিত্ব। চুরুলিয়া গ্রামের পূর্ণ-কুটির থেকে আগত এক কিশোর আর কলকাতার ইট-পাথরের কামরায় জীবন্ত অবস্থায় অচল, নির্বাক এক অগ্নিগর্ভ যুগস্রষ্টা-এ দু'য়ের মধ্যকার সময় খুব দীর্ঘ নয়। এই সময়ের মধ্যে ঘটে গেছে কাব্যে ও ইতিহাসে, ব্যক্তিত্বে ও ইতিহাসে, জাতীয়তার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর বিবর্তন। শুধু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে তাঁর অনন্য সৃষ্টি আর জীবন্ত অবস্থায় পাথরের মূর্তির মত সকলের কৃপাপ্রার্থী ও অসহায় বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সঙ্গীতকার।'

এ পর্যায়ে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে নিয়ে আসার একটি স্মৃতিচারণ এখানে তুলে ধরছি।

প্রয়াত মুস্তাফা সারওয়ার- তাঁর এক স্মৃতিচারণে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে আনার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যা এখানে তুলে ধরা হলো- বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে আনার পিছনে জাতির পিতা ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান চিরস্মরণীয়। এই ব্যাপারে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম বলে কবিকে বাংলাদেশে আনার ব্যাপারে কিছু তথ্য উল্লেখ করছি।

কাজী নজরুল ইসলামকে মাল্যভূষিত করছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

স্বাধীনতার পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার কাজে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর অতি ব্যস্ততার মাঝেও ক্ষমতাসীন দলীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে আমি দলের সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সময় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১৩৮০-র ১ জ্যৈষ্ঠ কবি নজরুলের জন্মবার্ষিকীতে ভারতবর্ষ থেকে কবিকে বাংলাদেশে আনার প্রস্তাব ও একটি পরিকল্পনা পেশ করা মাত্র তিনি রাজি হয়ে যান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি মিনি মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকে সরকারিভাবে কবি নজরুলকে বাংলাদেশে আনার জন্য ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। পরের দিন বিভিন্ন দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে আমাকে কবি নজরুলকে আনার জন্য ভারতে প্রেরণ করা হচ্ছে।

সেইদিন বিকেলেই পুরাতন গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সচিব জনাব রফিক উল্লাহ্ চৌধুরীর অনুরোধে আমি উপস্থিত হয়ে সেই সভায় কবি নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে আনার ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর

সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের যোগাযোগের বিষয়বস্তু জানতে পারি।

সেই অনুপাতে অফিসিয়াল চিঠিপত্রসহ তৎকালীন মন্ত্রী জনাব মতিউর রহমান এবং আমাকে নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কবি নজরুলকে আনার জন্য ভারতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়।

আমি প্রধানমন্ত্রীকে কবি নজরুলের কাছে একটি আমন্ত্রণপত্র দেওয়ার বিনীত প্রস্তাব দিলে বঙ্গবন্ধু সহাস্যে একমত পোষণ করেন এবং 'হে কবি' সম্বোধন করে কবি নজরুল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে আমাকে বলেছিলেন, আশা করি কবিকে ছাড়া খালি হাতে আসবে না।' মন্ত্রী জনাব মতিউর রহমানসহ আমরা দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছানোর পর সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হই। ঢাকার বেতার টিভিতে কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার সংবাদ বারংবার প্রচারিত হতে থাকে। দমদম থেকে কলকাতা শহরে যাবার রাজপথের নাম 'কবি নজরুল ইসলাম এভিনিউ।'

এই রাজপথে কতিপয় বামপন্থী রাজনৈতিক দলের ২/১টি পোস্টারে লেখা ছিল অসুস্থ কবি নজরুলকে নেয়া যাবে না। আমরা হোটেলে যেয়ে জানতে পারলাম কয়েকটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ডাক্তারের সার্টিফিকেট যোগাড় করেছেন, কবি অসুস্থ, বাংলাদেশে নেয়া সম্ভব নয়।

ঐ সময়ে কবি নজরুলকে বাংলাদেশে পাঠাবার বিরুদ্ধে কয়েকটি বিক্ষোভ হয়। কলকাতায় কয়েকটি সংস্থা কবি নজরুলকে বাংলাদেশে আনার বিপক্ষে থেকে কবির শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশে না নেয়ার সপক্ষে প্রচার আরম্ভ করেন।

ঈদের দিন 'রাইটার্স বিল্ডিং-এ মুখ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের সাথে আমাদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে কবি অসুস্থ বলে আপাতত ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার বিপক্ষে বিভিন্ন মতামত থাকার কথা জানতে পারি। সিদ্ধার্থ বাবুও এই ব্যাপারে চিন্তিত এবং সর্বদা যোগাযোগ রাখছিলেন। অসুস্থ কবিকে নেয়ার দায়িত্ব নিতে আমরা পারি কি-না এ ব্যাপারে মন্ত্রী মতিউর রহমান সাহেব চিন্তিত হয়ে আসার কথা ছিল। কিন্তু এর মধ্যে ঢাকা থেকে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব জনাব তোফায়েল আহমেদ, অন্যতম সচিব বর্তমানে মরহুম রফিকুল্লাহ চৌধুরীসহ অনেকের টেলিফোনে জানতে পারলাম কবিকে না নিয়ে আসলে ঢাকায় তুমূল বিক্ষোভ শুরু হতে পারে। রেডিও এবং সংবাদপত্রে বিশেষ বিমানে কবিকে কলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে আসার সময়সূচিও প্রচার হতে থাকে।

কিন্তু অসুস্থতার কারণে কবিকে না নিয়ে ফেরার কথা ভেবে আমিও বক্তিগতভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। মনে হয়েছিল কিশোর বয়সের লালিত স্বপ্নের কবিকে ঢাকায় নিতে না পারলে আমার জীবনটাও বোধহয় ব্যর্থ হয়ে যাবে। কবি পরিবারের ডাক্তারও সাথে থাকবেন। সেইদিন সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে তাঁর স্ত্রী ব্যারিস্টার মায়াদেবীর সহায়তায় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমি আলোচনা করে পরের দিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ আর একটি বৈঠকের অনুরোধ জানাই।

সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের কবি নজরুলকে অন্তত ১১ জ্যৈষ্ঠ জন্মবার্ষিকী দিবসে ঢাকায় উপস্থিত করে কিছুদিনের জন্য হলেও বাংলাদেশে নেয়ার প্রস্তাবটি পুনরায় পেশ করি। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকায় এত বিরোধিতা সত্ত্বেও কবিকে ভারত সরকার ঢাকায় আনার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অসুস্থ কবির দায়-দায়িত্ব নেয়ার এবং কবিকে ভারতে ফিরিয়ে দেয়ার যৌথ মতে তাঁকে বাংলাদেশে আনার অনুমতি দেয়া হয়। প্রথম থেকেই ভারত সরকার কবিকে সুস্থ রাখার সর্বপ্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

ঐ সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তড়িৎ সিদ্ধান্ত না নিলে পরবর্তীতে কবিকে ঢাকায় আনা হয়তো সম্ভবই হতো না। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পরের দিন অতি ভোরে কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ এবং অন্যদের সহায়তায় দমদম বিমান বন্দরে রক্ষিত বাংলাদেশ বিমানে কবিকে উঠিয়েই বিমান উড্ডয়নের ব্যবস্থা করা হয়। পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম কয়েকটি সংগঠন কবিকে বাংলাদেশে নেয়ার বিরোধিতা করে বিক্ষোভসহ বোমাও ফুটিয়েছিল। কলকাতার সাংবাদিকরাও ক্যামেরা নিয়ে বিমান বন্দরে ছুটে এসে আমাদের পাননি। কারণ ততক্ষণে কবি নজরুলকে নিয়ে বিমানটি আকাশে উড়ে গিয়েছিল।

বিমানটি আকাশে ওড়ার সাথে সাথে কবিপুত্র সব্যসাচী ও আমি বিমানের আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে বজ্রমুষ্ঠি হাত উঁচু করে উচ্চস্বরে আবৃত্তি করেছিলাম-

"বল বীর
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির"

কবি তখন আমাদের দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে দেখেছিলেন এবং মুখ নাড়ছিলেন। প্রায় আধ ঘন্টার মধ্যে ঢাকায় বিমানটি অবতরণকালে দেখা গেল হাজার হাজার মানুষ বিমানবন্দর ঘিরে কে কার আগে কবিকে ফুলের মালা দেবে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দিয়েছেন এবং বিমানটি দাঁড়াবার পর সিঁড়ি লাগানো

সম্ভব হচ্ছিল না। কবি তখন গরমে অসুস্থ হয়ে পড়লে উমা কাজী, সব্যসাচী, অঞ্জলি প্রমূখসহ আমিও সেবা-শুশ্রূষা আরম্ভ করি। ডাক্তার কবির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সময়ে অনেক চেষ্টা করেও বিমান বন্দরে আগত জনস্রোতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা যাচ্ছিলনা বলে বিমানের দরজা খুলে শান্ত হওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পরও বিমান বন্দরে আগত জনস্রোতকে শান্ত করতে বিলম্ব হচ্ছে বিশেষ করে কবি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লে বিমানের পিছনের দরজা দিয়ে আমি এবং সব্যসাচী কবিকে কোলে করে এ্যাম্বুলেন্সে গাড়িতে উঠিয়ে লুকিয়ে বিমানবন্দর ত্যাগ করে ধানমন্ডি কবিভবনে নিয়ে আসি। এভাবেই ১৯৭২ সালের ২৪ মে কবিকে বাংলাদেশে আনা হয়।'

দেশের বিশিষ্ট প্রয়াত বুদ্ধিজীবী নীলিমা ইব্রাহীম তাঁর এক ছোট্ট লেখায় নজরুল ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অবতারণা করেছেন। তার বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হলো- 'বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ও জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। এই দুই মহাপ্রাণের মান-ভাবনায় ও চিত্তাকাশে আমরা অপূর্ব মিল দেখতে পাই। নজরুল ছিলেন মানবতাবাদী ও ধর্মান্ধতামুক্ত।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আমরা সর্ব এই দুঃখী মানুষকে দেখতে পাই। তিনি তাদের জন্য আহার বাসস্থান ও ব্যাধিমুক্ত চেয়েছিলেন। এই আদর্শই গঠিত হবে তাঁর সোনার বাংলা। এই ছিল তাঁর ইচ্ছা।

নজরুলের মত তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল এক সুদৃঢ় হাতিয়ার। নজরুলের মত বঙ্গবন্ধুর কাছেও নর-নারীর কোন বিভেদ ছিল না। নজরুল লিখেছেন–

"কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।"

এই বৈষম্য বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর নবলব্ধ রাষ্ট্রের সংবিধানে নর-নারীকে সম-অধিকার দেওয়া হয়েছে।

নজরুল বারাঙ্গনার প্রশস্তি গেয়েছেন। আর বঙ্গবন্ধু লাঞ্ছিতা নারীকে সম্বোধন করেছেন বীরাঙ্গনা রূপে।

এই দুই মহাপ্রাণ নারীকে একান্তভাবে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন।

ধর্মান্ধতাকে উপহাস করে নজরুল কবিতা লিখেছেন আর বঙ্গবন্ধু ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করেছেন।

তাঁদের অন্তরের এই মিল দু'জনকেই আমাদের হৃদয়ে পাশাপাশি স্থান দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু নজরুল কাব্যের ভাবধারা দ্বারা অনেকাংশে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।'

১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে জাতীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছিল। সে সংবর্ধনায় সভাপতির ভাষণের উপসংহারে শ্রী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেছিলেন, -ফরাসী বিপ্লবের সময় প্রত্যেক মানুষ অতিমানুষে পরিণত হয়েছিল, আমার বিশ্বাস, নজরুলের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক একটি অতি মানুষে পরিণত হবে।'

বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে বীর সেনানীরূপে বাঙালি পেয়েছিল নজরুল ও বঙ্গবন্ধুকে। নজরুল ও বঙ্গবন্ধু তাই বাঙালির মানস সরোবরে ফুটে থাকা অবিনাশী পদ্মফুল। দু'জনই বাঙালির হৃদয়ে অমর অক্ষয় হয়ে থাকবেন। জয় বঙ্গবন্ধু- জয় নজরুল...।

এ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা তুলে ধরা হলোঃ

ইতিহাসের মহানায়ক তিনি। তাঁর নাম ছিল খোকা। ছোট্ট খোকাই একদিন হলেন এ মাটির সবচেয়ে দীর্ঘাঙ্গী সন্তান। মাটিমানুষের ভেতরেই তাঁর উত্থান। পাখি ডাকা, ছায়া ঢাকা নিভৃত নিঝুম গ্রাম টুঙ্গিপাড়া। শাখা নদী বাইগার। বাইগার নদীর কোল ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে পাটগাতী ইউনিয়ন। গোপালগঞ্জের পাটগাতী ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বাংলার মাটি ও মায়ের কোল ভরিয়ে ১৯২০ সালের ১৭মার্চ মঙ্গলবার, বাংলা ১৩২৭ সালের ২০ চৈত্র জন্মগ্রহণ করেন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মা এবং বাবা আদর করে ছেলের নাম রাখলেন খোকা। খোকাই একদিন সময়ের পালাবদলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিতে পরিণত হলেন। হলেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি। বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের জনক।

পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়রা খাতুনের তিনি তৃতীয় সন্তান। পিতা ছিলেন গোপালগঞ্জ মহকুমা দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদার এবং স্থানীয় ভূস্বামী। সাত বছর বয়সে তিনি পার্শ্ববর্তী গিমাডাঙ্গা সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরবর্তীতে প্রথমে গোপালগঞ্জ সরকারি পাইলট স্কুলে ও পরে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। খোকার দু'জন গৃহশিক্ষক ছিলেন। একজন শাখাওয়াত উল্ল্যাহ, অন্যজন হামিদ মাস্টার। হামিদ মাস্টার মূলত বিপ্লবী। হামিদ মাস্টারের বিপ্লবী প্রভাব বঙ্গবন্ধুর জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। মাধ্যমিক স্তরে পাড়াশোনার সময় তিনি দূরারোগ্য বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে কলকাতায় তাঁর চোখের অপারেশন হয়। এ সময় কয়েক বছর তাঁর পাড়াশোনা বন্ধ থাকে।

গায়ের ছেলে শেখ মুজিব টুঙ্গিপাড়ার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বাইগার নদী আর হাওর বাওরের মিলন গড়ে ওঠা বাংলার অবারিত প্রাকৃতিক পরিবেশে শৈশব আর কৈশোরের দুরন্ত সময় অতিবাহিত করেন। গ্রামের হিন্দু এবং মুসলমানের সম্মিলিত সামাজিক জীবনে তিনি দীক্ষা পান অসাম্প্রদায়িকতা। আর পড়শি গরীব মানুষের দুঃখ কষ্ট তাঁকে সারাজীবন সাধারণ দুঃখী মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসায় সিক্ত করে তোলে। এ সময়ে তিনি শিশু এবং কিশোরদের নিজ নেতৃত্বে সংগঠিত করতে গিয়ে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতারও পাঠ নেন। এরই প্রমাণ আমরা পাই ১৯৩৮ সালে গোপালগঞ্জ মহকুমা পরিদর্শনে আসা বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উপস্থিতিতে মুজিবের প্রতিবাদী নেতৃত্বের ভূমিকায়। মিশন স্কুলের ভাঙ্গা ছাদ দিয়ে পানি পড়া বন্ধে নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেখ মুজিব বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

গোপালগঞ্জের এই দুঃসাহসী সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ যুবক মন্ত্রীবর্গের সান্নিধ্যে গিয়ে খুঁজে পান তাঁর যোগ্য দিক্ষাগুরুর, আর গুরু খুঁজে পান তাঁর যোগ্যতর শিষ্য। সোহরাওয়ার্দী আর মুজিবের সাক্ষাৎ মুহূর্তটি বাংলার তথা ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে।

১৯৪২ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শেখ মুজিব উচ্চ শিক্ষার্থে কলকাতায় গিয়ে বিখ্যাত ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সুখ্যাত বেকার হোস্টেলে আবাসন গ্রহণ করেন। সময়টি ছিল বাংলার ইতিহাসের এক উত্তাল সময়। শেরে বাংলা, নেতাজী সোহরাওয়ার্দী আর আবুল হাশিমের মত বাঘা বাঘা নেতা বাংলার রাজনীতিতে সক্রিয়। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বজয়ী প্রতিভার আলোক রশ্মিতে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগৎ আলোকিত। দেশপ্রেমে, স্বাজাত্যবোধ আর হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পাশাপাশি কংগ্রেস মুসলিম লীগের বিভেদের রাজনীতিতে ক্ষত-বিক্ষত বাংলার সামাজিক- রাজনৈতিক জীবন। মুজিবের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক বিকাশ হয়েছিল এমন বিরাজমান আবহে। উদার গণতান্ত্রিক চেতনার পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক জাতীয় ঐক্যের চেতনায় তাঁর দীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছিল সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিমের সান্নিধ্যে।

শেখ মুজিব এ সময়ে ইসলামিয়া কলেজ ছত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৬ এর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময়ে শান্তি স্থাপনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা হিসাবে যে অসীমসাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন তা তাঁকে পরবর্তী জীবনে হিংসা বিদ্বেষের বিপরীতে অহিংস অসহযোগ

আন্দোলনের প্রতি আস্থাবান করে তুলেছিল। যা আমরা দেখতে পাই ১৯৭১ এর অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর কালজয়ী নেতৃত্বের মাঝে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তিনি চলে আসেন পূর্ব বাংলায় এবং ঢাকাকে তাঁর কাজের কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেন। দেশ বিভাগের পূর্বে স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক বাংলা গঠনের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসেন সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও শরৎ চন্দ্র বসু।

স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক বাংলা গঠনের দাবি শেখ মুজিবের অন্তরাত্মার এক স্বাধীন বাংলার স্বপ্নকে চিরস্থায়ী করে গেঁথে দেয়। তখন থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতে থাকেন স্বাধীনতার। দেশ বিভাগের পরপরই পূর্ব বাংলার রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ববাংলা সফরে এসে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু। তার এ ঘোষণা দেশের বিশেষত পূর্ববাংলার জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। শেখ মুজিবসহ ছাত্র নেতারা তীব্র ভাষায় এ ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রত্যাখান করেন এবং বাংলাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উত্থাপিত হলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১১ মার্চ ১৯৪৮ এ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা শেখ মুজিবসহ পূর্ববাংলা গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ছাত্রনেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একই অপরাধে কয়েকজন ছাত্রনেতাকে জরিমানা করে। সকলেই জরিমানা দিয়ে ছাত্রত্ব বজায় রাখলেও শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ অন্যায় আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানান এবং ফলশ্রুতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করে। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদী শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অন্যায় আদেশ কখনো মেনে নিতে পারেননি। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের রাজনীতির কালে ১২ বছরই তিনি কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। দু'বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। আঠার বার কারাবরণ করেছেন। সমগ্র জীবন তিনি চব্বিশটি মামলার মোকাবেলা করেন।

১৯৪৯ সালে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে সরাসরি গণরাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। যদিও পূর্ব থেকেই তিনি রাজনীতির বৃহত্তর অঙ্গণে পদচারণা

করছিলেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার সর্দার ইয়ার মোহাম্মদের ওয়ারীর রোজ গার্ডেনে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার প্রধান বিরোধী দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হলে তাঁকে কমিটির প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্ধারণ করা হয়। তিনি তখন করাগারে ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছে। বায়ান্নর ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের সময় শেখ মুজিব কারাগারে থেকেও আন্দোলনের নেতাদের সাথে যোগাযোগ রাখছিলেন।

কারান্তরালে থেকেও আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার এ কাজকে সরকার সুনজরে দেখেনি। মুজিবকে ঢাকা কারাগার থেকে ফরিদপুর কারাগারে স্থানান্তর করে দেয়া হয়। সেখানে থেকেও তিনি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। বাইরের আন্দোলনের সাথে যোগসূত্র রেখে কারাগারে তিনি অনশন ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। শেখ মুজিব ও অন্যান্য তরুণ নেতাদের দৌড়ঝাপের ফলে বাংলার তিন প্রধান রাজনীতিকের, হক, ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী ঐক্যে গড়ে ওঠে "যুক্তফ্রন্ট" নামের রাজনৈতিক প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে। যুক্তফ্রন্টের প্রধান সংগঠক ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। তিন নেতার অসাধারণ বাগ্মিতা আর মুজিবের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সংগঠনের কর্মকাণ্ডে পূর্ববাংলা মুসলিমল লীগের রাজনীতি ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব গণরায় প্রদান করে যুক্তফ্রন্টকে। ভরাডুবি হয় মুসলিম লীগের মাত্র ৩৪ বছর বয়সে আইন পরিষদের তরুণতম সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় সংবিধান পরিষদেরও সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে দলকে সুসংগঠিত করতে, মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে এবং দলের জনসম্পৃক্ত বাড়াতে তিনি মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক পদে কাজ করার দায়িত্ব বেছে নেন।

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন পাকিস্তানের রাজনীতিকে আপাদমস্তক পরিবর্তন করে দেয়। আইয়ুব খানের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের পথ খুলে দেয় সামরিক শাসন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বহু রাজনীতিবিদকে EBDO (Electoral Body Disqualification Order) দ্বারা রাজনীতি থেকে বিদায় করার উদ্যোগ নেয়া হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের নামে দুর্নীতির মামলা সাজিয়ে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়, যা থেকে তিনি হাইর্কোটে মামলা করে খালাস

পান। বিরাজনীতিকরণের এই ডামাডোলে স্বৈরাচারী সামরিক একনায়ক আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি ঘোষণার পাশাপাশি তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রভিত্তিক একটি সংবিধান প্রণয়ন করে তাঁর দুঃশাসনকে পাকাপোক্ত করার অপপ্রয়াস গ্রহণ করেন। এ্যাবডো এর বাধা সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সাংগঠনিক কার্যক্রম অব্যাহত রখেন। বিশেষত ছাত্রলীগের মাধ্যমে এই কার্যক্রমকে আরও জোরদার করা হয়। এই সময়ের ঘটনাবলীর মধ্যে শিক্ষা কমিশন বাতিলের দাবীতে ছাত্র আন্দোলন, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুক্তির দাবীতে আন্দোলন, ৯ নেতার বিবৃতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৬২ সালের তথাকথিত মৌলিক গণতান্ত্রিক সংবিধানের আলোকে প্রথম জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়। ১৯৬৪ সালে রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইতিমধ্যে মার্শাল ল' তুলে নেয়া হলেও আইয়ুবের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন অব্যাহত থাকে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী চিকিৎসা শেষে জুরিখ থেকে, ফেরার পথে বৈরুতের একটি হোটেলে মৃত্যুবরণ করেন। শেখ মুজিবের 'লিডার' এর মৃত্যুতে তাঁর ওপর সমগ্র দেশের গণতান্ত্রীক আন্দোলনের ভার এসে বর্তায়। সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুর পর শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের পুনর্গঠন করেন। আর সারা দেশের তরুণ, ত্যাগী এবং সাহসী আওয়ামী লীগ নেতারা মুজিবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ও সমবেত হতে থাকেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে সকল বিরোধী দল মিলে 'কপ' (Combined opposition parties) গঠন করে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ সাহেবের বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদপার্থী ঘোষণা করা হয়। এই নির্বাচনের সুযোগে শেখ মুজিব সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত থেকে একটি মজবুত দল গড়তে গণভিত্তি দিতেও সক্ষম হন।

আইয়ুবের সামরিক একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ধূমায়িত গণ অসন্তোষ যে কোনও সময়ে গণবিস্ফোরণে রূপ নিতে পারে, এ আশঙ্কায় জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে নিতে আইয়ুব খান হঠাৎ করে ভারতীয় কাশ্মীরে মুজাহিদ বাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সূচনা করেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে ১৯৬৫ এর পাক-ভারত যুদ্ধ নামে পরিচিতি লাভ করে। এই যুদ্ধে পাকিস্তান শোচনীয় পরাজয় বরণ করে।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছিল তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের মধ্যস্থতায় উজবেক রাজধানী তাশখন্দে

ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির মধ্য দিয়ে। আইয়ুবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এ চুক্তি মানতে পারেননি। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলার জনগণের পক্ষে থেকে তাশখন্দ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেন

১৯৬৬ সালের পাঁচ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের রাজধানী লাহোরে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য সম্মিলিত বিরোধী দলের বৈঠক বসলে শেখ মুজিবুর রহমান উক্ত বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তান জনগণের পক্ষ থেকে ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এটি ছয় দফা কর্মসূচী নামে খ্যাতি অর্জন করে এবং পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তির সনদ রূপে জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। লাহোর বৈঠকে উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষক বিরোধীদলসমূহের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয় এবং আইয়ুবের একনায়কতান্ত্রিক সরকার ছয় দফা মোকাবেলা করতে প্রয়োজনে কঠোর হবার হুমকি প্রদান করে।

পূর্ববাংলার জনগণের মাঝে অতি দ্রুত ছয় দফা কর্মসূচী জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর জন্য তা হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ছয় দফার মোকাবেলায় 'অস্ত্রের ভাষা' প্রয়োগের হুমকির পাশাপাশি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে শাসকগোষ্ঠী। পাকিস্তানের নবাবজাদা নাসরুল্লাহ্ খানের নেতৃত্বে এবং পূর্ব পাকিস্তানের আব্দুস সালাম খান প্রমুখের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে ৮ দফাপন্থী আওয়ামী লীগ গঠন করা হয়। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক করা হয়। জাতীয় পরিষদের সদস্য এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে এবং পূর্ব পাকিস্তানের আওয়মী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে ব্রত হন তাজউদ্দীন আহমদ।

নতুন নেতৃত্বের তুলনামূলক তারুণ্য ও উদ্দীপনা ছয় দফার আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে আসে। ছয় দফা হয়ে ওঠে বাঙালির বাঁচা-মরার দাবী । সাত জুন ১৯৬৬ সালে বন্দী মুক্তি দিবস উপলক্ষ্যে সারাদেশে হরতাল আহ্বান করা হলে তা ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। আইয়ুব-মোনেম চক্র কঠোর পন্থায় এই হরতাল মোকাবেলা করতে চাইলে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক নেতা মনু মিঞাসহ কয়েক জন নিরীহ ব্যক্তিও পুলিশের গুলিতে শাহাদতবরণ করেন। পুলিশী দমন পীড়নের পাশাপাশি চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রও অব্যাহত থাকে। কিন্তু কোন প্রকার নির্যাতন- নিপীড়নই শেখ মুজিব ও তাঁর তারুণ্যদীপ্ত সহকর্মীদেরকে তাঁদের লক্ষ্য থেকে পথচ্যুত করতে পারেনি। হতাশ শাসকগোষ্ঠী অবশেষে শুধু

রাজনৈতিক নয়, শারীরিকভাবেও শেখ মুজিবকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ভাঙ্গার খোঁড়া অজুহাত এনে তাঁকে প্রধান আসামী করে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সনের ১৮ জানুয়ারি 'আগারতলা ষড়যন্ত্র' নাম দিয়ে একটি ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের কর। শুধু তাই নয়, মামলার বিচারের জন্য বিচারপতি এস এ রহমান, বিচারপতি মুজিবুর রহমান খান ও বিচারপতি মাকসুমুর হাকিমকে নিয়ে ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল একটি বিশেষ আদালত বা স্পেশাল ট্রাইব্যুনালও গঠন করা হয়।

আগারতলা ষড়যন্ত্র মামলা সমগ্র পাকিস্তানের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সেই সাথে শেখ মুজিবের রাজনীতিও এমন এক মাত্রা লাভ করে যা তাঁকে রাজনীতির শীর্ষস্থানে নিয়ে যায়। বাংলার জনগণ শেখ মুজিবকে অবৈধ আইন প্রক্রিয়ায় দমনের এ আয়োজনকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা ১১ দফার আন্দোলন যাতে ৬ দফা কর্মসূচী হুবহু অন্তর্ভুক্ত ছিল। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর আকস্মিক অংশগ্রহণে আগরতলা ষড়যন্ত মামলা এবং শেখ মুজিবসহ রাজবন্দীদের মুক্তির আন্দোলনে রূপ পায়। এক পর্যায়ে পুলিশী নির্যাতনের মুখে আন্দোলনটি গণ আন্দোলনে রূপ পায়। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান রাজনৈতিক সমঝোতার লক্ষ্যে পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিন্ডিতে একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করেন। উক্ত বৈঠকে শেখ মুজিবকেও অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

আইয়ুব খানের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে, প্যারোলে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে। দলের ভেতর অনেকেই এই প্রস্তাব সমর্থন করলেও বেগম মুজিব ও শেখ মুজিবের তরুণ অনুসারীগণ ঘৃণাভরে প্যারোলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বেগম মুজিব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে মুক্ত স্বাধীন শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নিতে পারেন, আসামি মুজিব নয়। শেখ মুজিব বেগম মুজিবের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। আসামি হিসাবে গোলটেবিল বৈঠকে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এদিকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সনে সেনাবাহিনী এক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আগরতলা মামলার আসামিদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বন্দীদের ওপর গুলি চালালে মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক শাহাদতবরণ করেন, বেশ কয়েকজন আহত হন। ভাগ্যক্রমে শেখ মুজিব ও অন্যরা বেঁচে যান। সার্জেন্ট জহুরের শাহাদত গণ-অভ্যুত্থানকে তুঙ্গে নিয়ে যায় এবং শেখ মুজিব মুক্ত মানুষ হিসাবে গোলটেবিলে অংশ নেয়ার দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় আইয়ুবের

সরকার। রাওয়ালপিন্ডিতে যাওয়ার আগে শেখ মুজিবকে রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে লক্ষ জনতার সমাবেশে গণসংবর্ধনা দেয়া হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সনে। ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে ডাকসুর তদানীন্তন সহ-সভাপতি ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নিয়ে বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলায় ছয় দফা ও ১১ দফার আলোকে সমস্যা সমাধান করার আহ্বান জানান। আইয়ুব খানের ডাকা গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায়। সঙ্কটময় পরিস্থিতি সামাল দেয়ার নামে যথারীতি গণতন্ত্রের পথে না গিয়ে শাসকগোষ্ঠী সামরিক সমাধানের লক্ষ্যে সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করে এবং সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিকচক্রের প্রধান হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন ২৫ মার্চ ১৯৬৯। সামরিক শাসন জারি করলেও গণ-অভ্যুত্থানের শক্তিকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা শাসকগোষ্ঠীর ছিল না। তাই তার পরিস্থিতি সামাল দিতে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের কর্মসূচী ঘোষণা করে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর এক বেতার টিভি ভাষণে ১৯৭০ সালের ২৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। তাঁর ঘোষণায় তিনি এক ইউনিট ভেঙ্গে দেন, এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি ঘোষণা করেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন কায়েমসহ বেশকিছু মৌলিক নীতির কথা তুলে ধরেন।

তাঁর ঘোষণায় সংসদীয় ও ফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়। নানা ষড়যন্ত্র ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্ববাংলার আওয়ামী লীগ ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে জয়লাভ করে। নির্বাচনের বেশ কিছুদিন আগে পূর্ববাংলায় দক্ষিণাঞ্চলে ১২ নভেম্বর ১৯৭০ স্মরণকালের এক বিপর্যয়কর ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় দশ লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারায়। বঙ্গবন্ধু দুর্গত এলাকায় দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা ও পুনর্বাসনের কাজ চালান। একই সাথে তিনি নির্বাচনের তারিখ অপরিবর্তিত রেখে দুর্গত এলাকায় আসনগুলিতে ১৯৭১ এর ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন আয়োজনের দাবি করেন। এ সময় দুর্গত মানুষের প্রতি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা ও উপেক্ষায় ক্ষুব্ধ শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন শাহাবাগ হোটেলের এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন ঘোষণা করেন: "ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে নিহত ১০ লক্ষ লোকের মতো আরো ১০ লাক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়ে হলেও আমরা স্বাধীন জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার অধিকার আদায় করে নেব"।

বাংলার মানুষের স্বাধিকার তথা স্বাধীনতার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মপ্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে ১৯৭০ এর নির্বাচনে বাংলার মানুষের পক্ষে কথা বলার একক রায় ও আইনি অধিকার লাভ করেন। ইতিমধ্যে ১৯৬৯ এর ৫ ফেব্রুয়ারি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করতে গিয়ে এক ভাষণে পূর্ব বাংলার পরিচিতি বাংলাদেশ হবে মর্মে ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু। নির্বাচন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ দ্রুত একটি পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র চলতে থাকে যাতে বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় বসতে না পারেন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার না হয়। ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন করতে সামরিক বাহিনী ও শাসকগোষ্ঠী বেসামরিক মুখপাত্র জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রকাশ্য বিরোধিতার ফলে পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধ কাঠামো ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁর লক্ষ্য স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নীতি কৌশল গহণ করতে থাকেন। ৭ মার্চ ১৯৭১ এ তিনি রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন: "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"। "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল"। "তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। "এখানেই শেষ নয়, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে শেষ আলোচনায় তিনি সংকট সমাধানে পাকিস্তানের জন্য দুই সংবিধান, দু'টি স্বাধীন দেশের সমন্বয়ে একটি কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। এর আগে ২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সমর্থন নিয়ে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় মানচিত্র খচিত বাংলাদেশ পতাকা উত্তোলন করে। ২৩ মার্চ তথাকথিত পাকিস্তান দিবসে সমগ্র দেশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশকে চির পদানত করার লক্ষ্যে স্বাথীনতাকামী বাঙালির ওপর রাতের আঁধারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানের এই আক্রমণের মোকাবেলায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন ২৫ মার্চ মধ্যরাতে। শুরু হয় আমাদের মুক্তিসংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়-সশস্ত্র যুদ্ধ। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর বেতার টিভি ভাষণে ঘোষণা করছিলেন- Mujib is traitor to the nation, this time he will not go unpunished, অর্থাৎ মুজিব একজন বিশ্বসঘাতক। এবার তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে।

সমগ্র বাংলাদেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম। এই সংগ্রামকে সুসংবদ্ধ করতে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক

পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয় গণপরিষদ, গণপরিষদের এক সভায় ১০ এপ্রিল 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' গ্রহণ করা হয়। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করার হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এম মনসুর আলী, এ এইচ এম কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে সুর্দীঘ ৯ মাস বঙ্গবন্ধুর নামেই চলে আমাদের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ আমরা পূর্ণ বিজয় লাভ করি। ৯৫ হাজার সদস্য বিশিষ্ট পাকিস্তানী সেনা ও সহযোগী বাহিনীসমূহ ভারত বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ থেকে চিরতরে পাকিস্তানী দখলদারিত্বের অবসান হয়। কিন্ত স্বাধীনতার আনন্দ পূর্ণ হয় ১০ জানুযারি ১৯৭২ সালে। এই দিন পাকিস্তানের বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ করে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। দীর্ঘ ৯ মাসের নির্জন কারাবাসে বঙ্গবন্ধু সাহস হারাননি। বিশ্বাস হারাননি তাঁর প্রিয় জনগণের ওপর থেকে।

১২ জানুয়ারি ১৯৭২ তিনি দেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গঠন ও পূণর্গঠনের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন বঙ্গবন্ধু। অতিদ্রুত ও স্বল্পতম সময়ে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭২ সনের ১৬ ডিসেম্বর থেকে সংবিধান কার্যকর করা হয়। ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জন্য জাতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। তিনি বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ বিমান নাম দিয়ে জাতীয় এয়ার লাইন্স প্রতিষ্ঠা করেন। বিধ্বস্ত সড়ক ও রেলপথ, রেলসেতু ও সড়ক সেতু পূর্ণনির্মাণ করেন। জাতিসংঘ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, কমনওয়েলথ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হয় বাংলাদেশ এই সময়ে। ১৯৭২ সনে বিশ্বশান্তি পরিষদ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে "জুলিও কুরি" শান্তি পদকে ভূষিত করে। ১৯৭৪ সনে ২৪ সেপ্টেম্বর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করে বাংলাকে বিশ্বমানের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন।

সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এবং পাকিস্তানের সমর্থনপুষ্ট দেশীয় দালালেরা বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে। নানাভাবে বঙ্গবন্ধুর সাফল্যকে নস্যাৎ করার অপতৎপরতা শুরু করে। সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা তুঙ্গে ওঠে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দার সুযোগে জনগণের ব"হত্তর কল্যাণকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সনের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক

আওয়ামী লীগ 'বাকশাল নামে বহুমাত্রিক রাজনীতির একটি একক রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক দল গঠন করেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কায়েমী স্বার্থের এজেন্টরা রাতের অন্ধকারে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করে। ভাগ্যক্রমে দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশ থাকার ফলে বেঁচে যায়। বঙ্গবন্ধু মন্ত্রীসভার কুলাঙ্গার সদস্য খোন্দকার মোশতাক, তাহের ঠাকুর, ওবায়েদুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম প্রমুখ রাজনীতিকসহ সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দলছুট অংশ এই হত্যাকাণ্ডের নীল নকশা প্রস্তুত করে এবং তা বাস্তবায়ন করে। বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতবরণের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির একটি আলোকিত অধ্যায়ের অবসান হলেও তাঁর আদর্শের মৃত্যু হয়নি। স্বৈরতন্ত্র, সামরিক স্বৈরশাসন একনায়কতন্ত্র-বিরোধী বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের মাঝে তাঁর আদর্শ অবিনাশী হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুর কাছে মৃত্যুই পরাভূত আজ। মৃত্যুতেই তাঁর পুনর্জন্ম। ট্র্যাজিক মৃত্যুই তাঁকে ইতিহাসের মহানায়কে পরিণত করেছে। তিনি বাঙালি জাতির অবিনাশী চেতনার প্রতীক। তিনি আমাদের জাতির পিতা আজ। তিনি বেঁচে থাকবেন প্রতিটি বাঙালির স্বপ্নে আশায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হয়ে। বেঁচে থাকবেন আমাদের জাতি রাষ্ট্রের জনক হয়ে হাজার বছর ধরে।

নজরুলের জীবন ও সাহিত্যের কালপঞ্জি এ পর্যায়ে তুলে ধরা হলো:

১৮৯৯ ২৪শে মে (১১ জ্যৈষ্ঠ) ১৩০৬ বুধবার জন্মগ্রহণ।

১৯০৮ ২০শে মার্চ নজরুলের পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু।

১৯১০ আর্থিক সঙ্গতির অভাবে শিক্ষা বিঘ্নিত, মসজিদের ইমামতি। মাজারের খাদেমগিরি ইত্যাদি কাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ।

১৯১১-১২ শিয়ারসোল হাই স্কুলে প্রথমবার ভর্তি ও ঐ স্কুল ত্যাগ। মাথরুন নবীন চন্দ্র ইন্সটিটিউশনে ভর্তি। দুই বৎসর অধ্যয়ন। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে শিক্ষকরূপে লাভ।

১৯১৩ গার্ড সাহেবের চাকরী। আসানসোল রুটির দোকানে চাকুরী। পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফিকউল্লাহর সঙ্গে পরিচয় এবং তার স্নেহানুকূল্য লাভ।

১৯১৪ ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত দরিরামপুর হাই স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন। বার্ষিক পরীক্ষার পর দরিরামপুর ত্যাগ। [মতান্তর ১৯১৫ সালের মধ্যভাগে দরিরামপুর ত্যাগ।]

১৯১৭ ৪৯ নং বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান।

১৯১৯ লেখক হিসেবে নজরুলের আত্মপ্রকাশ। এই বছরে প্রথম রচনা প্রকাশ 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী', ১৩২৬-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মাসিক 'সওগাতে' প্রকাশ।

এই বছরে নজরুলের কবিতা প্রথম প্রকাশ। কবিতার নাম 'মুক্তি'। [বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ (১৩২৬) সংখ্যা।] নজরুল তখনো করাচী সৈন্য বিভাগে কার্যরত।

১৯২০ করাচী থেকে কলকাতায় আগমন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে বসবাস শুরু। এপ্রিল (বৈশাখ ১৩২৭) থেকে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় 'বাঁধনহারা' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু। জুলাই থেকে মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে নজরুল 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকা সম্পাদনের কাজে নিযুক্ত। ডিসেম্বর মাসে নজরুলের দেওঘরে গমন।

১৯২১ আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুলের কুমিল্লা গমন। সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে প্রণয়। বিবাহ ১৮ই জুন। ৩রা আষাঢ়, ১৩২৮। সৈয়দা খাতুনের নজরুলের দেওয়া নাম নার্গিস। নার্গিস পরিবারের সঙ্গে কোন বিষয়ে নজরুলের বিরোধ এবং ৪ঠা আষাঢ় ভোরে নজরুলের দৌলতপুর ত্যাগ। অক্টোবর মাসে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে নজরুলের শান্তিনিকেতনে গমন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা।

১৯২২ ৬ই জানুয়ারী 'সাপ্তাহিক বিজলী'তে 'বিদ্রোহী' প্রকাশ। এর কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে'ও একই সঙ্গে 'বিদ্রোহী' প্রকাশ। মার্চ মাসে নজরুলের প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশ। ১১ই আগস্ট অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' নজরুলের সারথ্যে প্রকাশ। ২ শে সেপ্টেম্বর 'ধূমকেতু'তে কবির 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশ এবং ১৩ই অক্টোবর ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী প্রকাশ। ২৫শে অক্টোবর 'অগ্নি-বীণা' প্রকাশ। ৮ই নভেম্ব রাজদ্রোহের অপরাধে নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী। ২ শে নভেম্বর কুমিল্লায় নজরুল গ্রেফতার।

১৯২৩ ৭ই জানুয়ারি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' রচনা। ১৬ই জানুয়ারি নজরুল ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ২২শে ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গীতিনাট্য 'বসন্ত' নজরুলের নামে উৎসর্গিত। এপ্রিল রাজনৈতিক বন্দীদের উপর জেলকর্তৃপক্ষের জুলুমের বিরুদ্ধে নজরুলের অনশন। ৩৯ দিন পর অনশন ভঙ্গ। ডিসেম্বরে নজরুলের মুক্তি লাভ।

১৯২৪ ২৫ এপ্রিল শুক্রবার আশালতা সেনগুপ্তের (প্রমীলা) সঙ্গে কলকাতায় হাজী লেনে নজরুলের বিবাহ এবং হুগলীতে ঘর-সংসার শুরু। প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম ও আকিকা উৎসব। কিছুদিন পরই এই সন্তানের মৃত্যু। 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙ্গার গান' প্রকাশিত ও বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা।

১৯২৫ মে ফরিদপুর কংগ্রেসে গান্ধীজীর সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎ। ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু। তাঁর মৃত্যুতে 'অর্ঘ্য', 'ইন্দ্রপতন' প্রভৃতি কবিতা রচনা।

'চিত্তনামা' প্রকাশ। সেপ্টেম্বরে হরেন্দ্র দত্তের কণ্ঠে রেকর্ডকৃত 'জাতের নামে বজ্জাতি সব' গানটি প্রকাশিত। ১০ই নভেম্বর The Labour Saraj Party of the Indian National Congress গঠিত। ঐ পার্টিও ইস্তেহার নজরুল কর্তৃক ঘোষিত ও প্রকাশিত। ১৬ই ডিসেম্বর 'লাঙল' প্রকাশিত। প্রথম সংখ্যায় সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ। [ঐ বছর ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত 'লাঙল' চলে।]

১৯২৬ কৃষ্ণনগর-এ বসবাস শুরু। কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে নজরুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয়। সেপ্টেম্বরে কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল (অরিন্দম খালেদ) এর জন্ম। প্রথম গজল রচনা 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল'।

১৯২৭ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' অধিবেশনে নজরুলের যোগদান ও ভাষণ প্রদান। আবুল কালাম শামসুদ্দীন কর্তৃক মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধে নজরুলকে 'যুগ প্রবর্তক' কবি বলে অভিহিতকরণ। ডিসেম্বরে 'আত্মশক্তি'তে নজরুলের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৯২৮ 'সওগাত' পত্রিকায় ইব্রাহীম খাঁর পত্রের উত্তরে নজরুলের বক্তব্য প্রকাশ। (পৌষ ১৩৩৪) মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান। মার্চে গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ও নিয়মিত যোগাযোগ। ফজিলাতুননেসার সঙ্গে পরিচয় ও অনুরাগ সঞ্চার। শরৎচন্দ্রের সংবর্ধনা উপলক্ষে নজরুলের গান রচনা। সাপ্তাহিক 'সওগাত'-এ 'নজরুলিস্তান' কলম প্রবর্তিত। [পরিচালক বাগবান]

১৯২৯ ১৫ই ডিসেম্বর (২ শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৬) রবিবার কলকাতার এলবার্ট হলে জাতির পক্ষ থেকে নজরুলকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও প্রধান অতিথি ছিলেন নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু।

১৯৩০ ৭ অথবা ৮ই মে বৈশাখ ১৩৩৭) নজরুলের দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু। 'প্রলয়শিখা' ও 'চন্দ্রবিন্দু' প্রকাশ-বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা।

১৯৩১ নজরুল ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেডের সুর-ভান্ডারী নিযুক্ত। জুন মাসে নজরুলের দার্জিলিং ভ্রমণ। সঙ্গে 'বর্ষবাণী' সম্পাদিকা জাহানআরা চৌধুরী ছিলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ১৯শে ডিসেম্বর কলকাতার রঙ্গমঞ্চে নজরুলের 'আলেয়া' মঞ্চস্থ।

১৯৩২ আগস্ট স্বদেশী 'মেগাফোন কোম্পানীতে' নজরুলের যোগদান।

১৯৩৩ ৩রা ডিসেম্বর 'ধ্রুব' ছায়াচিত্রের জন্য গান রচনা। ঐ চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়।

১৯৩৪ ১লা জানুয়ারি 'ধ্রুব' ছায়াছবির মুক্তি।

১৯৩৬ ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে নজরুলের সভাপতিত্ব ও অভিভাষণ দান।

১৯৩৭ (জানুয়ারি ১০) কলকাতার ওয়াছেল মোল্লা ম্যানসনের ঈদপ্রীতি সম্মেলনে নজরুলের ভাষণ 'সাহিত্যে জীবন ও যৌবন'।

১৯৩৮ কলকাতা বেতারে হারামনি, নবরাগ মালিকা, ইত্যাদি অনুষ্ঠানসমূহ নজরুল কর্তৃক পরিচালিত। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে কাব্যশাখায় সভাপতিত্ব। কবির সহধর্মিনী প্রমীলা দেবী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। ২১ জুন 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী। গান নজরুলের। 'বিদ্যাপতি' ছায়াচিত্রের কাহিনী ও গান রচনা। দৈনিক কৃষক পত্রিকার কার্যালয়ে নজরুল কর্তৃক জন সাহিত্য সংসদের উদ্বোধন।

১৯৩৯ 'সাপুড়ে' ছায়াচিত্রের কাহিনী ও গান রচনা।

১৯৪০ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির ঈদপ্রীতি সম্মেলনে নজরুলের অভিভাষণ। ১২ ডিসেম্বর ঢাকা বেতার কেন্দ্রের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানে নজরুলের যোগদান।

১৯৪১ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির (৫ ও ৬ই এপ্রিল) রজত জয়ন্তির সভাপতিরূপে ভাষণ দান। ২ শে মে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সভাপতিত্বে কলকাতায় মহাসমারোহে নজরুল জন্মদিবস উদযাপিত। ৭ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরপরই কলকাতা বেতার কেন্দ্রে 'রবিহারা' নামে কবিতা আবৃত্তি। অক্টোবরে দৈনিক নবযুগ (নব পর্যায়)-এর প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৪২ ১০ই জুলাই নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯ জুলাই মধুপুরে গমন। ৭ই অক্টোবর কলকাতায় লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যর্থ।

১৯৪৩ নজরুল নিরাময় সমিতি গঠিত। সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রদান।

১৯৫২ (জুলাই) নজরুল নিরাময় সমিতি কর্তৃক কবি সস্ত্রীক রাঁচির মানসিক হাসপাতালে প্রেরিত। চারমাস চিকিৎসার পর অপরিবর্তিত অবস্থায় কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

১৯৫৩ নিরাময় সমিতি কর্তৃক চিকিৎসার জন্য কবিকে লন্ডন ও ভিয়েনায় প্রেরিত (১০ই মে)। ১৫ই ডিসেম্বর নিরাময় না হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯৬২ ৩০ জুন কবি-পত্নী প্রমীলার ইন্তেকাল। [চুরুলিয়ায় দাফন]

১৯৭২ ২৪ মে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কবি পুত্রবধূ উমা কাজীসহ বাংলাদেশে আনীত।

১৯৭৫ ২৫শে জানুয়ারি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর কর্তৃক নজরুলকে সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রী প্রদান। ২২ জুলাই 'কবিভবন' থেকে পিজি হাসপাতালে স্থানান্তর।

১৯৭৬ জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নাগরিকত্ব প্রদান এবং একুশে ফেব্রুয়ারিতে 'একুশে পদক'-এ ভূষিত। ২৯ শে আগস্ট ১২ই ভাদ্র (১৩৮৩) রোজ রোববার সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কবি লোকান্তরিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ। ১২ই সেপ্টেম্বর জাতীয় শোকসভা।♦

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। হায়াৎ মামুদ, নজরুল ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬, ঢাকা।

২। মমতাজউদদীন আহমদ, 'প্রসঙ্গ বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ বাংলাদেশ', বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ১৯৯৭, ঢাকা।

৩। সেলিম আলফাজ, 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা', ১৯৭৬, নজরুল স্মারক সংখ্যা, ঢাকা

৪। ড. আতিউর রহমান, 'মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন', সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭, ঢাকা।

৫। প্রত্যয় জসীম, 'গদ্য', ১৯৯৭ আগস্ট সংখ্যা, ঢাকা

৬। মো. এরসাদ হোসেন, 'বিদ্রোহী কবি ও বঙ্গবন্ধু', নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০৯, ঢাকা

৭। মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর 'কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন' নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০২, ঢাকা

৮। মুহাম্মদ নূরুল হুদা, 'নজরুল ও বঙ্গবন্ধু', নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯৭, ঢাকা

৯। মো. হারুন উর রশীদ, 'নজরুল সাহিত্যে ধর্ম, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, ঢাকা

১০। প্রত্যয় জসীম, 'ছোটদের বঙ্গবন্ধু' মিজান পাবলিশার্স, ২০০৯, ঢাকা

১১। আসাদুল হক, 'চলচ্চিত্রে নজরুল', বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, ঢাকা

১২। জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত স্মারক সংকলন-১৯৯১, ঢাকা।

১৩। প্রত্যয় জসীম, বঙ্গবন্ধু ও নজরুলের রাষ্ট্রচিন্তা, জিনিয়াস পাবলিকেশন্স-২০১৯, ঢাকা।

জাতির একটি দুঃখবহ দিন

আতাতুর্ক কামাল পাশা

একটি দিনের কথা বলি। বঙ্গবন্ধুর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের হয়ত বছরখানেক বা সামান্য কম-বেশি হবে। একদিন ধানমন্ডি প্রধান সড়ক দিয়ে ৩২ নম্বরে ঢুকছিলাম। ঢুকেও পড়েছি। এমন সময় সামনে একটি ক্যানভাস-খোলা শুধু হুড লাগানো উইলী জীপ, সে সময় আমরা পাইলট গাড়ি বলতাম, তাতে একজন দাঁড়ানো পুলিশ হুইসেল বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছে, সাথে বসে থাকা আরো কিছু পুলিশ রয়েছে। তারই সামান্য পিছে একটি সাদা প্রাইভেট কার চলে যাচ্ছে। খেয়াল করলাম, পেছনের সিটে বঙ্গবন্ধু বসে আছেন ডানদিকে। তাঁর চিরাচরিত পাঞ্জাবী ঘিয়া রঙের, আর আমরা যাকে বলি মুজিব কোট, সেই কোট পরিহিত। সিটের পাশে, তাঁর ডানদিকের জালানাটি খোলা, তাঁর ডান হাতটি খোলা জালানা থেকে বাইরে আসা, আঙুলগুলো সে জালানাটির নিচের দিকে

রাবারটি ধরা। বঙ্গবন্ধু তাঁর সদাহাস্য-মুখে বাইরে তাকিয়ে আছেন, চশমা পরা। সালাম দিলাম, তিনি মাথা মৃদু নড়ালেন। তাঁর গাড়ি চলে গেল। এই দু'টি মাত্র গাড়ি। প্রথমটি সেন্ট্রি গাড়ি, দ্বিতীয়টি বঙ্গবন্ধুর গাড়ি। আর কোনো গাড়ি সেদিন দেখিনি। এই গাড়িটি ইন্দিরা গান্ধী উপহার দিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে গাড়িটি ভিভা গাড়ি ছিল। হয়ত তিনি দুপুরের আহারের জন্য বাড়িতে এসেছিলেন। আহারশেষে আবারো বঙ্গভবনের যাচ্ছেন। এই হলো আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর চলাফেরা। অথচ আজকের আমার এ লেখাটি সেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বিষাধঘন অগাস্টের মাসে। এ মাসেই তাঁকে অদেশপ্রেমিক, ভ্রান্ত, লোভী কিছু মানুষ নামের অমানুষ তাঁর বাসভবনে গভীর রাতে ঢুকে স্বপরিবারে হত্যা করে। ভাবতে অবাক লাগে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জেলখাটা মানুষ নেলসন ম্যান্ডেলার পর যিনিই একমাত্র নেতা সারা জীবনে ২৭ বছর জেল খেটেছেন যে বাঙালি জাতির জন্য, তাঁকেই এ দেশের কিছু বাঙালি নামের অমানুষ হত্যা করে।

অথচ এই নেতা জীবনের শুরু থেকেই মানুষের জন্য কাজ করেছেন। মানুষের দাবী আদায়ের জন্যই লড়াই করেছেন। তাঁর জীবনে অসংখ্য ঘটনা আছে, অনেকেরই জানা আছে, যেখানে তিনি মানুষের দাবী, ন্যায্য দাবী আদায়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ঘটনাটি সবারই জানা। কোনো এক স্থানে জেলা প্রশাসক এসেছিলেন, মহকুমা পরিদর্শনে। অদূরে কিছু মানুষ জটলা করছিল। বঙ্গবন্ধু সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁদের ভীড় করার কারণ জানতে চাইলেন। একজন বললেন, বাবা, ডিসি সাহেব এসেছে ভিজিটে। আমাদের এখানে পানীয় জল পাওয়া খুবই কষ্টের। একটু নলকূপের খুবই দরকার আমাদের। কিন্তু আমাদের তো ডিসি সাহেবের কাছে যাওয়ার কোন ক্ষমতা নাই, তাই দাঁড়িয়ে আছি। সেখানে যে প্রচণ্ড জলসংকট তা তিনি বুঝতে পারলেন, মানুষের অসুবিধার কথা অনুধাবন করলেন। সবাইকে সান্তনা দিয়ে তিনি বললেন, ঠিক আছে, আপনারা এখানেই থাকুন, আমি ডিসি সাহেবের সাথে কথা বলব।

যে-ই কথা, সে-ই কাজ। ডিসি সাহেব বের হয়ে যখন যাচ্ছিলেন, তখন তার পথ আগলে দাঁড়ালেন বঙ্গবন্ধু। সেন্ট্রি এসে সরিয়ে দিতে চাইলেও তিনি নড়লেন না। ডিসি সাহেব নেমে বঙ্গবন্ধুকে পথ আগলানোর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, এ এলাকার মানুষের বিশুদ্ধ পানির খুবই কষ্ট আপনি একটি নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা করেন। ডিসি বললেন, ঠিক আছে, আমি সদরে গিয়ে ব্যবস্থা করব। কিন্তু শেখ মুজিব বললেন, না স্যার, আপনি এখনই ব্যবস্থা করেন, একটি নলকূপ বসাতে কতোই বা খরচ হবে? আর আপনি একজন জেলা প্রশাসক, আপনি একটা নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা এখনই করতে পারবেন না?

সরকারী কতো টাকা তো খরচ হয়, এখানকার লোকরা যে পানিকষ্টে ভুগছে, তা লাঘব করতে আবার জেলায় গিয়ে আপনাকে আদেশ দিতে হবে, তা হবে না স্যার, আপনি এখনই ব্যবস্থা নেন। ডিসি বাধ্য হয়ে এসডিও ও সেখানকার কর্তৃপক্ষকে খুবই দ্রুত সেখানে একটি নলকুপ বসানোর আদেশ দিয়ে, ব্যবস্থা করে, অবশেষে যেতে পারলেন। বঙ্গবন্ধু এরকমই। তখন তিনি মাত্র উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য তিনি ছিলেন খুবই সোচ্চার।

১৯৩৯ সালে বঙ্গবন্ধু যখন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের ছাত্র তখন এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ পরিদর্শনে আসেন তখন শেখ মুজিব স্কুলের সমস্যা তুলে ধরে তাঁদের কাছে অনুদান আদায় করতে সক্ষম হন। এ সময়েই বঙ্গবন্ধুর মানুষের দুঃসময়ে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার মন-মানসিকতা জেগে ওঠে।

১৯৪২ সালে শেখ মুজিব মিশন হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স (মেট্রিক) পাশ করার পর তাঁর পিতা তাঁকে কলকাতায় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য যেতে উপদেশ দেন। পিতার আদেশেই তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য কলকাতায় আসেন এবং ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। এ সময়েই তার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সাথে পরিচয় হয়। শেখ মুজিব তাঁর রাজনৈতিক নীতিমালার যথার্থতা খুঁজে পান। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারই নেতৃত্বে শেখ মুজিব হলওয়েল মনুমেন্ট অবসানের জন্য আন্দোলন শুরু করেন।

১৯৪৪ সালে যুবক মুজিব কলকাতায় ফরিদপুরের ছাত্রদের সংগঠিত করেন। তাদের একজোট করে তিনি 'ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশান' গঠন করেন। সবাই তাকে এই সংগঠনের সম্পাদক নির্বাচিত করেন। এভাবেই শেখ মুজিব কলকাতায় আরো বৃহত্তর পরিসরে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এ বছরগুলোতে ফরিদপুর এবং পূর্ব বাংলার অন্যান্য প্রান্ত থেকে আসা দরিদ্র ছাত্রদের পড়াশুনার খরচ তিনি বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করে তাদের হাতে তুলে দিতে থাকেন এবং তাদের উচ্চতর শিক্ষার পথ সহজ করে দিতে থাকেন। আর এ বছরেই তিনি ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই এ পাশ করেন।

পরের বছরগুলোতে তিনি আরো বেশি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। উপমহাদেশের বড় বড় রাজনীতিবিদদের সাথে তাঁর পরিচয় হতে থাকে। তিনি তাদের সাথে তাঁর সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতির দিক নির্দেশনা নিতে থাকেন। মূলত তাঁর মনে সব সময় ছিল দুখী মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করার প্রবণতা। আর এ উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর রাজনীতিকে এ কল্যাণের পথে পরিচালিত করতেন।

১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। এ সময়েই পাকিস্তান ও ভারত নামে এ উপমহাদেশে আলাদা দু'টো রাষ্ট্রের জন্ম নিলো। মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলো নিয়ে পাকিস্তান এবং হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলো নিয়ে ভারতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ বিভাগ তিনি মেনে নিতে পারেননি। তবু তিনি মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন। পরের বছর তিনি ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন।

একইসাথে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। শেখ মুজিবের দাবীর প্রেক্ষিতেই ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। ১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবর সেখান থেকে মুসলিম বাদ দিয়ে এদেশীয় সংস্কৃতির সাথে সাযুজ্য রেখে জন্ম লাভ করল আওয়ামী লীগ। তিনি যখন কলকাতায় বেকার স্ট্রীটে থাকতেন এবং ইসলামিয়া কলেজে পড়তেন তখন থেকেই শের-ই-বাংলা ফজলুল হকের এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন। সে সময় তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে যখন পূর্ব বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় সে সময় তিনি ভাসানীর সাথে প্রতিবাদ আন্দোলন করেন পাকিস্তান প্রশাসনের বিরুদ্ধে এবং ভুখা মিছিলও করেন।

এর পরের বছরগুলোর কথাও আমাদের সবার জানা। পাকিস্তান সরকার এবং পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা পূর্বাংশকে তাদের পদলেহনকারী একটি অংশ হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এখানে উৎপাদিত পাট যা সারা বিশ্বে সোনালী আঁশ নামে গৃহীত হতো সেই সোনালী আঁশ ব্যবহার করে তারা পাকিস্তানের করাচীতে অনেক শিল্প-কারখানা গড়ে তোলে। এখানে কর্ণফুলী নদীর তীরে বৃহত্তম একটি কাগজের কল বানায় তারা। উপমহাদেশের বৃহত্তম কাগজের কল ছিল এটি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের প্রস্তুত কাগজ পশ্চিম পাকিস্তানে সিকিভাগ মূল্যে বিক্রি হতো এবং এখানে তার চারগুণ মূল্যে বিক্রি হতো। পূর্ব পাকিস্তানে অনেক চিনিকল গড়ে ওঠে। এখানে উৎপাদিত চিনি পাকিস্তানের সরকারি গুদামে গিয়ে সংরক্ষিত হতো এবং রাষ্ট্রীয় হিসাবের আওতায় আসতো। তারপর তা বিক্রির আদেশ জারী হতো। সেই চিনি পশ্চিম পাকিস্তানে বিক্রি হতো অনেক কম মূল্যে। আর পূর্ব পাকিস্তানে বিক্রির সময় করাচী সমুদ্র বন্দর থেকে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে আনার খরচসহ অন্যান্য কর আরোপ করে অনেক বেশি মূল্যে সাধারণ ক্রেতার কাছে বিক্রি করা হতো। একই রাষ্ট্রে দুই নীতি, দুই ধরনের মূল্যতালিকা দেখে শেখ মুজিব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি দেখতে পান সরকারি চাকরিতে এবং সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক কম মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। আর দেশের প্রশাসনিক ও অন্যান্য বড় বড় চাকরির পদগুলো পশ্চিম পাকিস্তানীরা দখল করতে থাকে।

বেগম মুজিব, শেখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধু ও শেখ কামাল

শুরু হয় তাঁর জাতীয় পর্যায়ে সংগ্রাম, গণমানুষের জন্য সংগ্রাম, দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম। তিনি পাকিস্তান সরকারের সামনে ৬ দফা দাবী পেশ করলেন। পরবর্তীতে ১১ দফা দাবী পেশ করলেন। পাকিস্তান সরকার এমন তেজোদীপ্ত রাজনৈতিক নেতাকে দেখে অনেকটাই ঘাবড়ে গেল। তারা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনকে নিষ্ক্রীয় করতে নেতা-কর্মীদের ওপর জুলুম অত্যাচার শুরু করল। বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় শেখ মুজিবকে জেলে রাখা শুরু করল।

কিন্তু এতো জেল-জুলুম-হুলিয়া করেও দেশের মানুষকে এবং শেখ মুজিবের কণ্ঠকে দাবিয়ে রাখা গেল না। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মিথ্যা রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা আগরতলা মামলা রজ্জু করে তাঁকে কারাগারে ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু ততদিনে দেশের মানুষ সংগ্রাম করতে শিখেছে। তারা সংগ্রাম শুরু করল পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে এবং শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেবার জন্য।

১৯৭০ সালে জাতীয় নির্বাচন হলো। দেশের মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শেখ মুজিবকে ভোটে নির্বাচিত করল। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশি ছিল, সে কারণে শেখ মুজিব বেশি ভোট পেলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবীরা একজন বাঙালির হাতে শাসনভার তুলে দিতে রাজি হলো না। তারা বিভিন্নভাবে চক্রান্তের জাল বিছাতে থাকল।

মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর সবশেষ উৎসর্গ স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে সঁপে দেয়া। তিনি জানতেন যে কোন সময়ে তারা

তাঁকে হত্যা করতে পারে, ফাঁসীতে ঝোলাতে পারে, তাঁ সে সময়ের অনেক নেতা ও কর্মী তাঁকে দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে বলে কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি বললেন, আমাকে না পেলে ওরা দেশের মানুষকে পাইকারী হারে মারবে, দেশের অগণিত মানুষ মারা পড়েব, এটি আমি চাই না। তিনি পাকিস্তান সামরিক জান্তার হাতে ধরা দিলেন। তারা তাকে বন্দি করে নিয়ে পাকিস্তান কারাগারে আটক রাখলেন।

এ প্রবন্ধটি শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর ভীতিহীনতা দিয়ে। সে প্রসঙ্গেই আবার চলে আমি। বঙ্গবন্ধু জানতেন, তিনি সারা জীবনই সাধারণ মানুষের পক্ষে লড়ে গেছেন, তাদের দাবী আদায়ে কাজ করে গেছেন, তাদের জন্য রাজনীতি করে গেছেন, সুতরাং কেন এ দেশের মানুষ তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে? এ কথা তিনি কখনো বিশ্বাস করেননি। একজন সত্যিকারের মনপ্রাণনিবেদিত নেতার এমনটি মনে না আসাটাই স্বাভাবিক। সারাজীবন যিনি শুধু দিয়েই গেছেন, সারাজীবন যিনি শুধু সাধারণ মানুষের জন্য করেই গেছেন, তাঁকে একটি পরম শত্রুও তো ক্ষতি করার কথা চিন্তা করতে পারে না।

কিন্তু সেটিই হয়েছে। ১৫ আগস্ট কিছু ক্ষমতালোভী, বাঙালি জাতির কাছে বেঈমান বলে চিহ্নিত, কিছু কুচক্রী সেনাসদস্য তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সব সদস্যকে রাতের আঁধারে হত্যা করল। এ ইতিহাস যেন অবিশ্বাস্য। বঙ্গবন্ধুকে যেদিন সপরিবারে হত্যা করার সংবাদ বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ সেদিন পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো নেতাই তা বিশ্বাস করতে চাননি। অনেকেই বিশ্বাস করতে চাননি কারণ, যিনি সারাজীবন সাধারণ, অভাবী মানুষের জন্য লড়ে গেছেন, তাকে কিভাবে মানুষ হত্যা করতে পারে! পাকিস্তান সরকার তাদের ঘোরতর শত্রুকে যেখানে হত্যা করতে পারেনি, সেখানে তাঁকে এ দেশে হত্যা করা হলো এ কেমন করে সম্ভব! সেদিনের সে মাসটা ছিল অগাস্ট। বাঙালি জাতির একটি চরম বেদনার দিন।

আজও ফিরে এসেছে সেই রক্তঝরা বেদনার মাস। যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও সামান্য ক'জন নামকা ওয়াস্তে পাহারাদারকে নিয়ে চলতেন, তাঁকেই এদেশের মানুষ হত্যা করল। অবশ্যই এটি দেশ ও জাতির জন্য দুঃখবহ দিন।♦

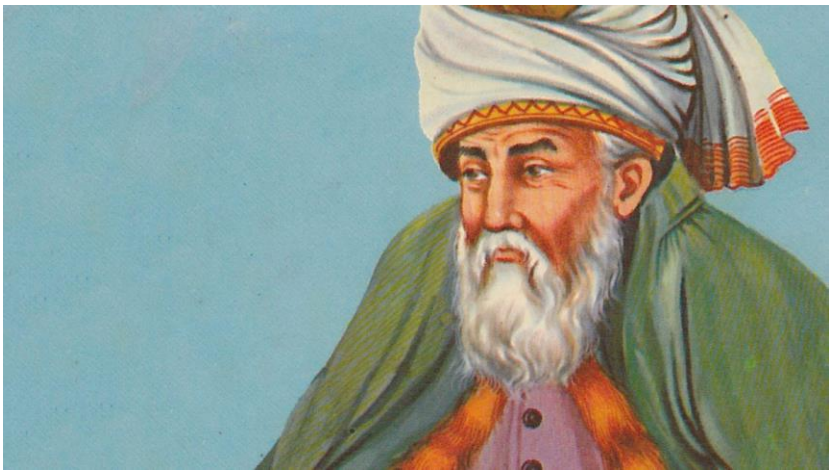

মসনবী শরীফের গল্প

সুলতান মাহমুদ ও চোরের আড্ডা

ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

সুলতান মাহমুদ গজনবী জনগণের হাল অবস্থা জানার জন্য রাতে একাকী টহল দিচ্ছিলেন আত্মপরিচয় গোপন করে। আলো-আঁধারে একদল চোরের আড্ডায় গিয়ে তিনি হাজির হন অতর্কিতে। চোরেরা বলল, কে ভাই তুমি কোথায় যাও, তোমার পরিচয় বল। আমিও তোমাদের দলীয় লোক ঘুরছি সুযোগের সন্ধানে, সুলতান জবাব দিলেন। চোরেরা বলল, তাহলে এসো আমাদের আড্ডায়। আজ রাতে অভিযানে যাওয়ার আগে প্রত্যেকে আমরা বলব কার কি কৃতিত্ব ও বিশেষ যোগ্যতা আছে, যাতে অভিযানে কাজে লাগাতে পারি প্রত্যেকের যোগ্যতা সঠিকভাবে। তাদের আসল উদ্দেশ্য সুলতান কোন ধরনের চোর তার পরীক্ষা নেয়া, মান নির্ণয় করা। জোসনার আলো আঁধারিতে গল্পের ছলে তারা ব্যক্ত করে প্রত্যেকের বিশেষ কৃতিত্ব।

একজন বলল, আমার কৃতিত্ব আমার দুই কানে গচ্ছিত। চুরি করতে গেলে গৃহস্থের কুকুর যখন ঘেউ ঘেউ করে তখন আমি বুঝতে পারি কুকুর কী বলছে। চোরেরা বলল, যদি মূল্য নির্ণয় করি তাহলে বলতে হবে দুই পয়সার বেশি হবে না তোমার এই কৃতিত্বের দাম। কুকুরের আওয়াজের মর্ম বুঝে এমন কী লাভ হবে আমাদের।

আরেক চোর বলল, আমার কৃতিত্ব আমার দুই চোখে দেখ। রাতের নিকষ অন্ধকারে আমি যাকে দেখি, দিনের আলোতে তাকে দেখলে হুবহু চিনতে পারি। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না রাতের আঁধারি বা আলোর ঝলকানি।

আরেক চোর বলল, আমার বাহুতে এমন শক্তি ও কৃতিত্ব আছে, যা দ্রুত সাহায্য করে অভিযান এগিয়ে নিতে। আর তাহল যত শক্ত মাটি হোক সিঁধ কাটতে আমার বাহুবলের শক্তি অজেয়। একেবারে সুড়ঙ্গ তৈরি করতে পারি নিমিষে।

আরেক চোর বলল, আমার কৃতিত্ব সঞ্চিত আমার নাকে। আমি যদি মাটির গন্ধ শুঁকি ঠিকঠিক বলতে পারি মাটির ভেতরে লুকানো ধন কোথায় কী আছে। তখন তোমাদের বলে দিতে পারব, মাটির কোন স্তরে কোন ধরনের ধনরত্ন সংরক্ষিত কীভাবে।

মাটির গর্তের ন্যায় মাটির দেহেও গচ্ছিত থাকে অগাধ ধনরত্ন। তবে এই রহস্য খুব কম লোকই জ্ঞাত আছে।

সিররে আন্নাসু মাআদেন দাদ দস্ত
কে রাসূল আন রা পেয়ে ছে গুফতে আস্ত
মানুষ গুপ্তধন স্বরূপ–এ কথার রহস্য এখানে
ভেবে দেখ নবীজি বলেছেন কোন উদ্দেশ্যে। ৬ খণ্ড. ব-২৮২৬

গুপ্তধন উদ্ঘাটন করতে হলে গুপ্তধনে অভিজ্ঞ রত্নবিশারদ হতে হবে। তারাই গুপ্তধনের মর্ম বুঝতে পারবে। মানুষের প্রতিভা, ভালো মন্দের মূল্যমান নিরূপণের জন্যও প্রত্যেকের মাঝে লুক্কায়িত গুপ্তধন চেনার যোগ্য লোক হতে হবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, মানুষ প্রকৃতি স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির মত। যারা ইসলামপূর্ব যুগে উত্তম ইসলাম গ্রহণের পর দ্বীনের পাণ্ডিত্য অর্জন করলে তারাই উত্তম বিবেচিত হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে যোগ্যতা প্রতিভা ও পাপপুণ্যের চেতনার বিচারে মৌলিক যোগ্যতার অধিকারী। তবে তার মূল্যমান নিরূপণের জন্য দক্ষ জহুরীর দরকার।

চোর বলল, আমিও জহুরীর মতো দেহের মাটি শুঁকে বলতে পারি, কোন ধরনের ধনরত্ন গচ্ছিত আছে। বলতে পারি, কোন খনিতে কত ধনরত্ন আছে বা

কোন খনি ধনরত্নশূন্য। হ্যাঁ, মানুষের ভেতরকার প্রতিভা, যোগ্যতা ও মানবীয় গুণাবলী নিরূপণের কষ্টিপাথর আল্লাহর ওলীদের আয়ত্বে আছে। মজনুর মতো আমি মাটি শুকিয়ে পেয়ে যাব লাইলীর কবরের ঠিকানা। লাইলী মারা যাওয়ার পর মজনু লাইলীর গোত্রের কাছে গিয়ে জানতে চায়, লাইলীর কবর কোথায়। কিন্তু কেউ তাকে বলে না লাইলীর কবরের ঠিকানা। মজনু তখন কবরস্তানে গিয়ে একে একে কবরের মাটি শুঁকতে থাকে। শেষে লাইলীর কবর ঠিকই আবিষ্কার করে। জনৈক আরবি কবি বলেছেন,

আরাদু লিয়ুখফু কাবরাহা আন মুহিব্বিহা
ওয়া তীবু তুরাবিল কাবরি দাল্লা আলাল কাবরি
লোকেরা চেয়েছিল তার কবর গোপন রাখবে প্রেমিকের কাছ থেকে
কিন্তু কবরের মাটির খুশবু বলে দিল লাইলীর কবর কোথায় আছে।

নাসিকান্দ্রিয় বিশেষজ্ঞ চোর আরো বলল, যে কোনো জামা আমি শুঁকে বলতে পারব কোনটি য়ুসুফ (আ)-এর জামা কিংবা কোনটি কোন দৈত্যের কাছ থেকে নেওয়া। নবীজির কথা চিন্তা কর, তিনি বলেছিলেন, আমি দূর ইয়ামেনের দিক থেকে ওয়াইস কারানীর সুবাস পাচ্ছি ।

এবার আরেক চোর এগিয়ে তার দক্ষতার বর্ণনা দিল। আমার বাহুতে পাঞ্জায় এমন জোর আছে যদি কোনো ফাঁদ ছুঁড়ে দেই পাহাড়ের মতো উঁচু দেয়ালের উপর, অমনি আমি নিজে আর সবাই প্রাচীর টপকে পৌঁছে যাই কাঙ্খিত প্রাসাদে। আমার এই ফাঁদের মাজেযা নবীজির ফাঁদের মতো। তিনি ফাঁদ পেতেছিলেন আকাশের নিলীমায় দৃষ্টির সীমানায়।

হামচো আহমদ কে কমন্দ আন্দাখত জাঁশ
তা কমন্দশ বুর্দ সূয়ে আসেমাঁশ
আমার ফাঁদ নবীজির ফাঁদের মতো যিনি
রূহের ফাঁদ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন আসমান পাড়ি। ৬খ. ব-২৮৩৪

মেরাজ রজনীতে তিনি যেভাবে সাত আসমান পাড়ি দিয়ে আরশে আযীমে পৌঁছেন তাকে বলা যায় আসমান পাড়ি দেয়ার ফাঁদ হিসেবে। আল্লাহ তো তাঁকে বলেন,

গোফত হক্কাশ আই কামন্দ আন্দাযে বাইত
অ'ন যেমন দান মা রামাইতা ইয রামাইত
বায়তুল মামুরে পাড়ি দেয়ার যে ফাঁদ পেতেছিলেন আপনি
আমারই ফাঁদ ছিল, যখন নিক্ষেপ করেছিলেন, আপনি করেননি। ৬খ. ব-২৮৩৫

নবীজি মেরাজে আসমান পাড়ি দিয়েছিলেন। মনে হবে, তিনি উর্ধ্বলোকে ফাঁদ ছুঁড়ে আরশে গিয়েছিলেন সাত আসমান ছাড়ি। নবীজিকে আল্লাহ বলেছিলেন, ওহে যে আমার দিকে আসতে ফাঁদ ছুড়ে দিয়েছেন, এই ফাঁদ আপনি ছুড়েননি; বরং আমি নিজেই ছুঁড়েছি। আপনার সব কাজ চিন্তা ও অবস্থা আমার জন্যই নিবেদিত। আমিই আপনাকে পরিচালনা করি। 'হে নবী! আপনি যখন কাফেরদের দিকে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহই সেই তীর নিক্ষেপ করেছিলেন।' (সূরা আনফাল, আয়াত-১৭) অর্থাৎ নবীজির নিক্ষেপণ ছিল আল্লাহর নিক্ষেপণ। নবীজির কদমের অনুগামী আল্লাহর নেক বান্দা ওলী আল্লাহরাও আল্লাহর সেই সাহায্যে বলিয়ান। তাদের জীবন-মরণ, ধ্যান-জ্ঞান আল্লাহর জন্যই নিবেদিত। সর্বাবস্থায় আল্লাহতে সমর্পিত।

এবার বাদশাহর কৃতিত্ব জাহিরের পালা । চুরি করতে গিয়ে কোন বিশেষ কৃতিত্ব তার আছে প্রমাণ করতে হবে চোরদের দলে ভিড়তে হলে। বলল, নতুন বন্ধু! বল দেখি, তোমার এমন কী কৃতিত্ব আছে যা আমাদেরকে শক্তির জোগান দিতে পারে।

গোফত দর রীশাম বুয়াদ খাসিয়্যাতাম
কে রহানাম মুজারেমান রা আয নেকাম
বলল, আমার কৃতিত্ব রক্ষিত আমার দাড়ির ভাঁজে
যত অপারাধী পার পেয়ে যায় শাস্তির হাত থেকে। ৬খণ্ড. ব-২৮৩৭

আমার কৃতিত্ব যা আছে তা আমার এই দাড়ির মাঝেই আছে। দাগি আসামীদের ছাড়িয়ে নেয়ার বিশেষ কৃতিত্ব আছে আমার দাড়ির ভাঁজে। ধর, ফাঁসির আসামীকে জল্লাদের হাতে যাদের সোপর্দ করা হয়েছে, সেই মুহূর্তে যদি আমার দাড়ি দুলে উঠে তখন অপরাধী শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায়।

মুজরেমান রা চোন বে জল্লাদান দাহান্দ
চোন বেজুম্বদ রীশে মন ঈশান রাহান্দ
অপরাধীদের যখন সোপর্দ করা হয় জল্লাদের হাতে
আমার দাড়ি নড়ে উঠলে ওরা মুক্তি পেয়ে যায় তাতে। ৬খ. ব-২৮৩৮

চোরেরা শুনে বলল, আমাদের দলনেতা কুতুব তুমিই । আমরা যদি কোনো বিপদের সম্মুখীন হই আমাদের জন্য যদি শাস্তি অবধারিত হয়, তখন তোমার দাড়ি দুলিয়ে দিলে আমরা মুক্তি পেয়ে যাব–এর চেয়ে বড় পাওনা আর কী হতে পারে। কাজেই তুমি আমাদের দলনেতা। চল সবাই আজ রাতেই অভিযান হবে রাজপ্রাসাদে।

চোরেরা চলল ধীরপদক্ষেপে সুলতান মাহমুদের রাজভবন পানে। সুলতানও চলেছেন তাদের সাথী হয়ে সন্তর্পনে। কিছুদূর অগ্রসর হতেই ডান দিক থেকে

একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তখন কুকুরের আওয়াজের মর্মবোদ্ধা চোর বলে উঠল, বন্ধুরা এই কুকুর বলছে বাদশাহ আমাদের সাথেই আছেন। কিন্তু তারা ছিল রাজপ্রাসাদ চুরির অভিযানে সাফল্যের চিন্তায় বিভোর। কুকুরের আওয়াজের সমঝদার চোরের কথায় কর্ণপাত করার ফুরসত তাদের নেই।

আরেফবিল্লাহ তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, হে মানুষ! তুমি যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সাথে আছেন। তোমাদের দেখছেন। তোমাদের সবকথা শুনছেন। তোমরা নিজেদের কথা ও কাজের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাক। কারণ একদিন কড়ায়-গন্ডায় হিসাব দিতে হবে। কিন্তু দুনিয়ার সহায় সামগ্রী জোগাড় করার, দুনিয়াকে লুটেপুটে খাওয়ার নেশায় মোহে যারা বুঁদ হয়ে আছে তাদের ফুরসত নাই আল্লাহর ওলীদের সতর্কবাণী শ্রবণ করার। আল্লাহ সবখানে আছেন, সবকিছু দেখেন, সবার সবকথা শোনেন এ কথা তারা বিশ্বাস করেও করে না। এখানেও চোরের দল তাদের তত্ত্বজ্ঞানী বন্ধুর কথায় সায় দিল না। কুকুর যে বলল, বাদশাহ তোমাদের সাথে আছেন তা নিয়ে মোটেও চিন্তা করল না। কারণ, সবাই আচ্ছন্ন ছিল স্বর্ণ রৌপ্য হীরা জহরত ও দুনিয়া কামানোর ঘোরে।

চোরেরা সুলতান মাহমুদের রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেল। আলো আঁধারিতে একটি মাটির টিবি দেখে ভাবল, হয়ত এখানে গুপ্তধন আছে। গন্ধবিশারদ চোর তার নাক লাগিয়ে শুঁকে দেখল। বলল, না এখানে কোনো ধনরত্ন নেই। এক বৃদ্ধা বিধবার পতিত ভিটের টিবি এটি। চোরেরা তাদের অভিযান এগিয়ে নিতে অদম্য। সুলতানের রাজপ্রাসাদে গিয়ে দেখে বিরাট প্রাচীরের বেষ্টনী। তখন ফাঁদ বিশারদ চোর তার দক্ষতার স্বাক্ষর রাখে। পর্বত সমান উচ্চতায় ফাঁদ ছুঁড়ে সবাই দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে। গন্ধবিশারদ চোর আরেক স্থানে নাক লাগিয়ে বলল, হ্যাঁ, এই তো আমাদের কাঙ্খিত গন্তব্য। এখানেই সুলতানের ধনরত্ন গচ্ছিত।

সিঁধ কাটার দক্ষ চোর সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেলল গুপ্তধনের খাজানা বরাবর। শাহী প্রাসাদের মালামাল চুরির সে কি উৎসব। স্বর্ণ, রত্ন, রৌপ্য, তৈজসপত্র, আরো দামি জামা কাপড় সরিয়ে নেয়ার সতর্ক তৎপরতা চলল রাতভর। পুরো ঘটনায় সুলতান তাদের সাথে পেছনে আছেন। দেখলেন, কার পরিচয় কি, কোথায় আড্ডা আখড়া, চুরির মাল জমাচ্ছে কোথায়। এক ফাঁকে সুলতান কেটে পড়লেন চোরদের মাঝ থেকে।

রাজপ্রাসাদে এসে সুলতান বিলম্ব করলেন না একটুও। দক্ষ ঝানু নিরাপত্তা রক্ষীদের পাঠিয়ে দিলেন চোরদের পাকড়াও করতে। চোরেরা তখনো আখড়ায় বিশ্রামে যায়নি; রাজকীয় পাইক পেয়াদা গিয়ে হাতেনাতে পাকড়াও করে নিয়ে আসে কয়েদ করে চুরির অপরাধে। চোরদের দেহমনে তখন ভয়ে আতঙ্কে

তরতরে কম্পন। কারণ, তারা জানে, অপরাধীর প্রতি কত কঠোর সুলতানের শাসন। সর্বোচ্চ শাস্তি করুণ পরিণতি অপেক্ষমাণ তাদের কপালে।

হাতকড়া পরা চোরেরা সুলতানের দরবারে । স্বয়ং সুলতান এখন বিচারের এজলাসে। এই সেই সুলতান, যিনি গেল রাতে আকাশের চাঁদনির মতো তাদের মাঝে ছিলেন দেদিপ্যমান। এই জগতের আসল সুলতান তো সেই মহামহিম, দুনিয়ার রাতে তিনি আছেন তোমাদের সবার সাথে। নৈতিক চরিত্র আর শরীয়তের প্রাচীর টপকে যারা দুনিয়ায় লুটপাট চালায়, তিনি তাদের সাথেও থাকেন, তার নজরদারি এড়ানোর কারো সাধ্য নাই। সময় মতো তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যান। কাল ভোরে যখন তাদের পাকড়াও করে হাজির করা হবে পরকালের আদালতে তখন দেখবে রাতের সেই চাঁদনি আকাশের সূর্যরূপে তাদের সামনে দেদিপ্যমান। তিনিই হবেন বিচারদিনের একচ্ছত্র মালিক।

যে চোরের কৃতিত্ব ছিল রাতে যাকে দেখে দিনের বেলা হুবহু তাকে চিনে ফেলে সে দেখল আজ রাজ সিংহাসনে সমাসীন স্বয়ং সুলতান, তিনিই গেল রাতে তাদের মাঝে ছিলেন বিরাজমান।

শাহ রা বর তখত দীদ ও গোফত ইন
বূদ বা মা দূশ শাবগার্দ ও করীন
বাদশাহকে সিংহাসনে আসীন দেখে বলল চোর
ইনিই আমাদের সাথে টহল দিয়েছেন গেল রাতভর। ৬খ. ব-২৮৫৪
অ'ঙ্কে চান্দীন খাসিয়্যত দর রীশে উস্ত
ইন গেরেফতে মা হাম আয তফতীশে উস্ত
ইনিই যার দাড়িতে লুকানো হাজারো কারিশমা
আমাদেরও পাকড়াও করেছে তার সন্ধানী চশমা। ৬খ. ব-২৮৫৫

যে চোর কুকুরের আওয়াজের মর্ম বুঝত সে বলেছিল, কুকুর বলছে, বাদশাহ স্বয়ং আমাদের সাথে আছেন।

গোফত ওয়াহুয়া মাআকুম ইন শাহ বূদ
ফে-লে মা মী দীদ ও সেরমান মী শানূদ
বলল, তোমাদের সাথে যে আছেন তিনি তো বাদশাহ
আমাদের কাজ দেখছেন, শুনছেন অকথিত রহস্য যা যা। ৬খ. ব-২৮৫৭

আল্লাহ পাক বলেন,

'তিনি তোমাদের সাথেই আছেন যেখানেই তোমরা থাকো না কেন।,আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সবকিছুর দ্রষ্টা।' (সূরা আল হাদীদ, আয়াত-৪)

তত্ত্বজ্ঞানী চোর বলল, রাতেই আমার চোখ ধন্য ছিল বাদশাহর পরিচয় পেয়ে। সারারাত তার চেহারার প্রেমে মগ্ন ছিলাম আমি একাগ্র হৃদয়ে। তত্ত্বজ্ঞানী আরেফ বিল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, দুনিয়ার জীবন যে রজনীর মাঝে কাটিয়েছি, তাতে আমি আল্লাহর পরিচয় পেয়ে মজেছিলাম তার প্রেমে। বুঝেছিলাম তিনি সারাক্ষণ আমাদের সাথেই আছেন। তাই তার চেহারার রূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কেটেছে আমার সমগ্র জীবন। আজ সেই বাদশাহর কাছে জানাব আমার লোকদের গোনাহ মাফির আবেদন। আমার বিশ্বাস তিনি এই অভাগার আকুতি ফিরিয়ে দেবেন না। যে চোখ আল্লাহর প্রেমে আত্মহারা থাকে, তার আবদার আলাদা আল্লাহর সমীপে।

যান মুহাম্মদ শাফেয়ে হার দাগ বূদ
কে যে জুয হক চশমে উ মা যাগ বূদ
মুহাম্মদ (সা) যে গুনাহগার দাগির শাফায়াতকারী
কারণ তার দুনয়ন বিচ্যুৎ হয়নি আল্লাহর দর্শন ছাড়ি। ৬খ. ব-২৮৬১

কিয়ামতের দিন নবীজি অগণিত গুনাহগারের শাফায়াত করবেন। হযরতের এই শক্তির রহস্য উদ্ঘাটন করে মওলানা বলেন, আল্লাহর দর্শন লাভে নবীজির দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। (সূরা নাজম, আয়াত-১৭) এই দুনিয়া, যা রাতের আঁধারের মতো, এখানে হাকিকতের সূর্য ঢাকা আছে মানুষের দৃষ্টি হতে। কিন্তু নবীজির দৃষ্টি সদা প্রখর। পূর্ণিমা শশীর মতো মহামহিমের রূপমাধুরি দর্শনে নবীজি ছিলেন বিভোর। এই প্রখর দৃষ্টিশক্তির রহস্য উদ্ঘাটন করে মওলানা আরো বলেন,

আয আলম নাশরাহ দো চশমশ সুর্মা য়াফত
দীদ অনচে জিব্রাঈল অন বর নাতা'ফত
আলম নাশরাহ-র সুরমা মাখা নবীজির দুই চোখে
তিনি দেখেছেন জিব্রাঈলের সাধ্য ছিল না যা দেখবে। ৬খ. ব-২৮৬৩

তার চোখে ছিল আলম নাশরাহ এর সুরমা মাখা। ফলে তিনি এমন কিছু দেখেছেন যা দেখার শক্তি ছিল না স্বয়ং ওহীবাহক ফেরেশতা জিব্রাঈলের। এ বয়েতে ইঙ্গিত রয়েছে নবীজির আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচায়ক সূরা আলম নাশরাহ লাকা-র দিকে। 'আলম নাশরাহ লাকা' মানে আমি কি আপনার অন্তরকে প্রসারিত করে দেইনি? যে এতিমের চোখে আল্লাহ নিজে সুরমা মেখে দেন সে তো হাকিকতের দুনিয়া অনায়াসে দেখবে, তাতে আপত্তি কিসে। নবীজির এই দৃষ্টিশক্তির কারণে কুরআনে তার অন্যতম উপাধি শাহেদ, সাক্ষী। সাক্ষী হওয়ার জন্য দুটি উপাদান অনিবার্য প্রয়োজন। একটি প্রখর দৃষ্টিশক্তি, দ্বিতীয়টি নিজের দেখা বিষয় ব্যক্ত করার বাচনিক শক্তি। দুনিয়ার আদালতে বাদী বিবাদী হাজারো

যুক্তিতর্ক করে; কিন্তু হাকিমের মনযোগ থাকে সাক্ষীর দিকে। আদালতে হাকিম সাক্ষীকে দেখেন দুটি চোখ রূপে। সাক্ষীর এই গুরুত্বের কারণ কী? ঘটনা তো বাদীও জানে, বিবাদীরও জানা থাকে। কিন্তু তাদের এই জানা স্বার্থদুষ্ট কলুষিত পক্ষপাতিত্বে, মতলববাজিতে। কিন্তু শাহেদ সাক্ষীর দৃষ্টি থাকে স্বার্থমুক্ত, মতলববর্জিত পক্ষপাতহীন। তার দুচোখ আচ্ছন্ন করতে পারে না মতলববাজি স্বার্থচিন্তার পর্দা এসে।

হক হামী খাহাদ কে তো যাহেদ শাওয়ী
তা গরয বুগযারী ও শাহেদ শাওয়ী
আল্লাহ তো চান তুমিও হও স্বার্থমুক্ত পবিত্রমন
স্বার্থ, মতলববাজি ছেড়ে কর সাক্ষীর যোগ্যতা অর্জন। ৬খ. ব-২৮৭২

আল্লাহর ইচ্ছা হল, তুমিও নিজেকে নিঃস্বার্থ, আল্লাহর জন্য নিবেদিত, কুধারণা কুভাবনা-মুক্ত পবিত্রমনের অধিকারী কর। কারণ, স্বার্থচিন্তা, নফসের কামনা বাসনা চোখের সামনে পর্দা টেনে দেয়। এই পর্দায় ন্যায় ও সত্যকে দেখার মনের সৌন্দর্য লুকিয়ে যায়। ভালোমন্দ ফারাক করতে পারে না তখন। এর কারণ, 'কোনো কিছুই প্রতি অন্ধ ভালোবাসা স্বার্থচিন্তা মানুষকে অন্ধ বানায়।' তবে যার অন্তরে আল্লাহর নূরের তাজাল্লী পতিত হয় তার হৃদয় আলোয় উদ্ভাসিত। তার মনের আকাশে গ্রহতারার আলোর প্রয়োজন হয় না । যেমন দিনের বেলা সূর্য উদিত হলে আকাশের তারারা লুকিয়ে যায়।

ইনসানে কামিল এর মর্যাদায় এই মর্তবার অধিকারী ছিলেন প্রিয় নবীজি। তাই তিনি মুমিন ও কাফেরের দিলের গতিবিধি ভালোভাবে জানতেন। মানব রূহের এই গতিবিধি চেনা ইনসানে কামিল ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহর দুনিয়ায় মানব রূহের চেয়ে রহস্যময় আর কিছু নাই। দেখ দুনিয়ায় ভালো মন্দ সমস্ত কিছুর পরিচয় ব্যক্ত করেছেন আল্লাহ তাআলা। অথচ রূহের বেলায় বলেছেন ,

'আপনার কাছে তারা রূহ এর স্বরূপ সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি বলুন, রূহ হল আমার প্রতিপালকের আদেশ বিশেষ। এবং তোমাদেরকে অতি সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে। (সূরা ইসরা, আয়াত-৮৫)

এই রূহের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারেনি দুনিয়ার কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বা বিজ্ঞানী। অথচ ইনসানে কামিল প্রিয়নবী হযরত (সা) জানতেন রূহের আসল পরিচয়। তাই তার উপাধি ছিল তিনি শাহেদ, সাক্ষী। আল্লাহর অন্যতম নাম 'ন্যায়বিচারক'। ন্যায়বিচারের সাথে সত্যের সাক্ষীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই অর্থেই নবীজি ছিলেন সাক্ষী। তাঁর পবিত্র রূহের উপর প্রতিফলিত ছিল আল্লাহর ন্যায়বিচারক গুণবাচক নামের উদ্ভাস। জেনে রেখ,

মানযারে হক দিল বুয়াদ দর দো সরা
কে নযর দর শাহেদ আয়দ শাহ রা
উভয় জাহানে তার নজরে থাকে মানুষের অন্তর
কারণ, বাদশাহ দেখেন কার অন্তর প্রেমে কাতর । ৬খ. ব-২৮৮২

আল্লাহ মানুষের বাইরের সৌন্দর্য বেশভূষা দেখেন না। তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরের সৌন্দর্য। কুরআন মজীদে এর প্রতিপাদ্য আয়াত-

'যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।' (সূরা শোয়ারা, আয়াত, ৮৮, ৮৯)

আই য়ারানা লা নারাহু রূয ও শব
চশমে বন্দে মা শুদে দীদে সবব
যিনি রাতদিন আমাদের দেখেন আমরা দেখিনা তাকে
কারণ ও সামগ্রির মোহ পর্দা ঢেকেছে আমাদের চোখে। ৬খ. ব-২৮৮৯

স্বার্থচিন্তা জাগতিক বিষয়-আশয় আমাদের চোখে পর্দা টানিয়ে রেখেছে। ফলে আমরা তাকে দেখি না। অথচ রাতদিন তিনি আমাদের দেখেন, আমাদের সাথেই আছেন। তাই তার কাছে প্রার্থনা-

য়া রব্বি আতমিম নূরানা ফীস সাহেরা
ওয়ানজেনা মিন মুফযিহাতিন কাহেরা
প্রভুহে হাশরের দিন দাও আমাদের পূর্ণ মাত্রায় নূর
মুক্তি দাও অপমান হতে, যত লজ্জা-গ্লানি কর হে দূর। ৬খ. ব-২৮৯২

রাতে বাদশাহর পরিচয় পেয়ে যে চোরের দৃষ্টি প্রখর, সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে অদম্য সাহসে সে আজ মুখর। বলল, জাঁহাপনা! গেল রাতে পরিচয় গোপন করে আমাদের মাঝে ছিলেন। বলেছিলেন, আমার কৃতিত্ব দাড়িতে। আমার দাড়ি হেলানে ফাঁসির আসামী খালাস পায়। আমরা প্রত্যেকে নিজের কৃতিত্ব জাহির করেছি সত্য। কিন্তু সব কৃতিত্ব দুর্গতি বয়ে এনেছে আমাদের জন্য । আমাদের যোগ্যতা কৃতিত্বের বহর আমাদের গলার ফাঁশ হয়েছে। আপনার কৃতিত্বের দাড়ি দুলিয়ে দয়া করে গুনাহগারদের খালাস দিন। সুলতান তাকালেন সেই চোখের দিকে গেল রাতে যা বিভোর ছিল বাদশাহর চেহারার সাথে মিতালিতে। তার সম্মানে বিচার আদালতে সুলতান তার দাড়ি নাড়লেন। কী আশ্চর্য, সেই ইশারায় রহমতের পরশে অপরাধীরা বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন। (মওলানা রূমীর মসনবী শরীফ, ৬খ. বয়েত: ২৮১৬-২৯২১)।♦

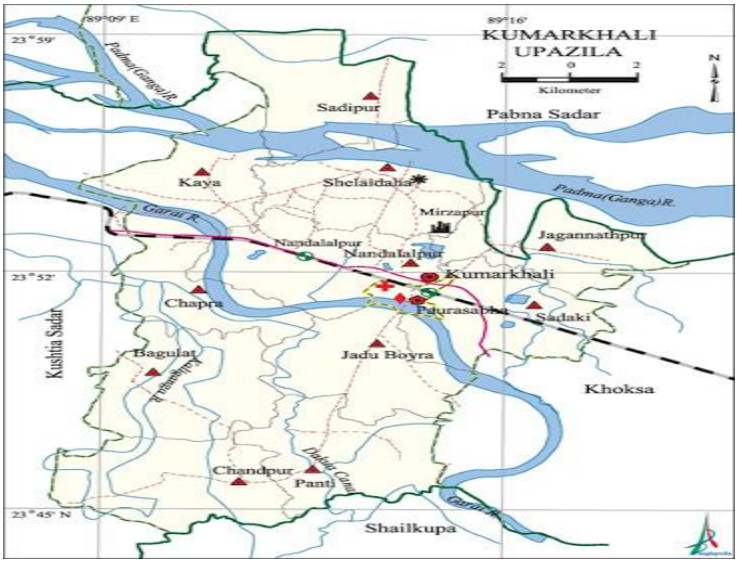

কুমারখালীর পীর-আউলিয়া ও ধর্মীয় সংস্কারকগণ

মাহমুদ জামাল

পীর-আউলিয়াগণের অবদান

আরব মুসলমানদের মাধ্যমেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রবেশ করে এবং এঁদের মধ্যে ছিলেন অনেক জলিলুল কদর সাহাবাই কিরাম (রা)।[১] পরবর্তীকালে আউলিয়া, দরবেশ, সূফি, সাধক ও মসজিদের ইমামগণের মাধ্যমে তা প্রচার-প্রসার লাভ করেছে।[২] তবে ইসলাম তথা মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের অনেক পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের সাথে আরবদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিলো বলে জানা যায়। এমনকি হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের কয়েক হাজার বছর পূর্বেও দক্ষিণ আরবের সাবা কওমের ব্যবসায়ীরা পাল তোলা জাহাজে চড়ে এদেশে আসতো। সাবা কওমের

নামানুসারেই ঢাকার অদূরে 'সাভার' নামকরণ করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 'সাবা' থেকে 'সাবাউর'[৩] এবং সেখান থেকেই বর্তমানের 'সাভার'।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের নাম 'বরেন্দ্র' হিসেবে সুপরিচিতি। এই নামের পিছনেও আরব বণিকদের সাথে সম্পর্ক লুকিয়ে রয়েছে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। সাগর মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আরব বণিকেরা বাংলাদেশের সীমানায় নদীতে অবতরণ করে হিন্দের মাটির দেখা পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বলতো 'বার্ বিরান্দ' অর্থাৎ হিন্দের মাটি। পরবর্তীতে এই 'বার্ রিরান্দ' শব্দটি অপভ্রংশ আকারে বরেন্দ্র নামে অভিহিত হয়।[৪] সেই সময় থেকেই বাংলাদেশের সাথে আরবদের যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা পরবর্তীকালে ইসলামের আবির্ভাবের পর আরও ঘনিষ্ঠতা লাভ করে।

মহানবী (সা) ইসলাম প্রচারের কাজ আরম্ভ করার সাথে সাথেই ভারতবর্ষেও ইসলামের সুশীতল সমীরণ বইতে শুরু করে। বিদায় হজ্বের ভাষণে মহানবী (সা)-এর ঘোষণা শুনে সাহাবা-ই-কিরাম (রা)-গণ দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েন ইসলামের সুমহান বাণী নিয়ে। তাঁদের অনেকেই পৌঁছে যান তৎকালে 'হিন্দ' নামে পরিচিত পাক-ভারত উপমহাদেশ এবং তার পথ ধরে এই বাংলাদেশ অঞ্চলে। তাঁদের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।[৫] মালাবরের অন্তর্গত চেরদেশের রাজা 'চেরুমল' এবং রতন নামে দু'জন অমুসলিম ওই সময় আরবে গিয়ে স্বয়ং মহানবী (সা)-এর কাছে ইসলাম ধর্ম কবুল করে রতন বিন আব্দুল্লাহ আল হিন্দ নাম ধারণ করে আল্লাহর রাসূলের (সা) সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন বলে জানা যায়।[৬]

ড. আ ন ম রইছউদ্দীন এ অঞ্চলের বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আবুল হাসান আলী নদভীর সুত্রে আরব ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে প্রবেশের যে রুট বর্ণনা করেছেন তা হলো, তারা ভারতের কালিকট ও মাদ্রাজ হয়ে বঙ্গপোসাগরে প্রবেশ করতেন, সেখান থেকে প্রথমে তাঁরা সিলেটে যেতেন; সিলেট তখন ছিলো বন্দর ও ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে বেশ প্রসিদ্ধ। সিলেটকে আরবরা 'সালাহাত' বলতো। সেখান থেকে তাঁরা বাংলাদেশের অপর বন্দর চট্টগ্রাম যেতেন, যাকে তারা 'সাতগ্রাম' বলতেন। তারপর তারা ভারত ও চীনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী 'সিয়াম'[৭] হয়ে চীন সাগরে পাড়ি জমাতেন।[৮] ৭ম শতাব্দিতে আরব বণিকদের ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের সাথে এই যোগাযোগ উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক একটি বন্ধন তৈরি করে। এদেশের মানুষ মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ইসলাম কবুল করতে থাকে। তখন ভারতে তখন চলছিলো গুপ্ত রাজাদের শাসনকাল (৩২০-৬৫০ খ্রিস্টাব্দ)। মালিক বিন দিনারের

হাতে ভারতের প্রথম মসজিদটি নির্মিত হয় কেরালায় ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে।[৯] পরবর্তীতে মুসলিম সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাশিমের (৬৭২ খ্রিস্টাব্দ) এবং আরো পরে মুহাম্মদ ঘোরী (৯৭১-১০৩০) হাত ধরে গুজরাটের পথ দিয়ে ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ সালে বাংলা বিজয় করেন। এরপর বাংলায় মুসলমান বসতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ দ্রুত ঘটতে শুরু করে।

গৌড় কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ফলে এ অঞ্চলেও ইসলামের সুবাতাস এসে পৌঁছে সমসাময়িক সময়েই। তবে ঠিক কব কীভাবে ইসলাম এখানে প্রবেশ করে তার সঠিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম প্রচার গ্রন্থে শ ম শওকত আলী পঞ্চদশ শতকে এখানে ইসলাম প্রবেশ করে বলে যে মত দিয়েছে তা সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কেননা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় (৫৭০-৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) ইসলাম ভারতবর্ষে আগমন করে সিন্ধু, গুজরাট, মালাবার হয়ে। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী গৌড় জিয় করে ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে। অথচ সেখান থেকে মাত্র ১০০ মাইল পূর্বে কুষ্টিয়ায় ইসলাম প্রবেশ করতে আরো ৩০০ বছর লাগার কথা নয়।

তখনকার সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিলো ইসলামের একেবারে বিপরীত অবস্থানে। মানুষের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, মুসলিম আর অমুসলিম আলাদা করাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক সেই সময় কুষ্টিয়া তথা কুমারখালী অঞ্চলে আগমন ঘটে বেশ কয়েকজন ফকিহ্ দরবেশের, যাঁদের সংস্পর্শে এসে এখানকার মানুষ আবার ইসলামের মহীয়ান শিক্ষায় জেগে উঠতে সক্ষম হয়। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সম্পর্কে নিচে অলোচনা করা হলো।

আগেই বলা হয়েছে, মূলত জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ্র শাসনামল থেকেই অত্রাঞ্চলে মুসলিম বসতি শুরু হয়। বেশ কয়েকজন পীর-দরবেশ ওই সময়ে কুমারখালী অঞ্চলে আগমন করেন। তাঁদের সংস্পর্শে এখানকার মানুষের মাঝে ইসলামের সুশীতল সমীরণ বইতে শুরু করে। এঁদের মধ্যে হযরত খোরশেদুল মুলক (র), হযরত বুড়ো দেওয়ান (র), হযরত শাহ দরবেশ জংগলী শাহ (র), হযরত পীর চাঁদ শাহ দেওয়ান (র), দরবেশ সোনাবন্ধুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হযরত খোরশেদুল মুলক (র)

হযরত খোরশেদুল মুলক (র) ইরানের অধিবাসী ছিলেন বলে জানা যায়। হযরত খান জাহান আলী ইসলাম প্রচারের জন্য যশোরের বারবাজার থেকে তাঁকে

উত্তর দিকে প্রেরণ করেন। হযরত খোরশেদুল মুলক (র) নিয়ে যে কথা প্রচলিত আছে সেটি হলো হযরত খোরশেদুল মুলক (র) পদ্মা নদী পাড়ি দেয়ার জন্য খেয়া নৌকায় ওঠেন। নৌকা যখন মাঝ নদীতে তখন মাঝি তাঁর কাছে পাড়ের পয়সা দাবি করলে তিনি বলেন, 'বাবা আমি মুসাফির, আমার কাছে পয়সা-কড়ি নেই।' একথা শুনে মাঝি তাঁকে নৌকা থেকে নেমে যেতে বলে। হযরত খোরশেদ-উল-মুলক হাতের আশা তখন পানিতে নিক্ষেপ করলে মাঝ নদীতে চর জেগে ওঠে। তিনি সেখানে নেমে যান এবং প্রথমেই জায়নামাজ বিছিয়ে নামায আদায় করেন। এই স্থান পরবর্তী পর্যায়ে তিনি আর ত্যাগ করেননি। এখানে বসেই তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন। এই স্থানটি আজকের শিলাইদহ ইউনয়নের খোরশেদপুর হিসেবে পরিচিত। তাঁর নামানুসারেই এখানকার নামকরণ 'খোরশেদপুর' হয়েছে বলে জানা যায়।

হযরত খোরশেদুল মুলক (র) পঞ্চদশ শতকে এখানে আগমন করেন বলে ধারণা করা হয়। ইন্তেকালের পর তাঁকে এখানেই সমাহিত করা হয়। তাঁর মাজারটি দীর্ঘদিন অবহেলা আর অযত্নে পড়ে থাকার পর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারী নিয়ে এখানে আগমন করলে মুসলমান প্রজাদের অনুরোধে তিনিই প্রথম মাজারটি সংস্কার করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু সে মাজারটির বর্তমান অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। অযত্ন, অবহেলায় এটাকে দেখে আর মনে করার কোন উপায় নেই যে, এখানে ঘুমিয়ে আছেন এ অঞ্চলের প্রথম ধর্মীয় সংস্কারক হযরত খোরশেদুল মুলক (র)-এর মত দরবেশ।

হযরত বুড়ো দেওয়ান (র)

দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর শাসনামলে ১৫১৪ সালে এই দরবেশ এখানে আগমন করেন। তাঁর আসল নাম পীর আব্দুর রশিদ। তাঁর ওস্তাদ পীর হযরত শাহ আলীর আদেশে তিনি বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের জন্য এখানে এসে কয়া ইউনিনের সুলতানপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এখান থেকে তিনি অত্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। একারণে কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা অঞ্চলে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এলাকার লোক তাঁকে শ্রদ্ধাভরে বুড়ো দেওয়ান বলে সম্বোধন করতেন বলে তিনি এ নামেই সমধিক পরিছিতি লাভ করেন। ১৫৬২ সালে তিনি তাঁর আস্তনাতেই শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেন। তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। আজও তাঁর মাজারটি সেখানে বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত শাহ দরবেশ জংগী শাহ (র)

মুঘল বাদশা শাহজাহানের শাসনামলে (১৬-১৬) বাগদাদ থেকে আর একজন সাধক পুরুষ ইসলামে প্রচারের ব্রত নিয়ে এই অঞ্চলে আসেন। তিনি কুমারখালীর দরিমালিয়াট গ্রামের গহীন জঙ্গলে আস্তানা স্থাপন করেন। তাঁর প্রকৃত নাম নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। তবে এলাকার লোক তাঁকে জঙগী শাহ নামে জানে। কুমারখালী পূর্বদিনের ঐ অঞ্চলটি তখন খাল, বিল পরিবেশিত অবস্থায় জংগলে পরিপূর্ণ ছিলো। ফলে সেখানে মনুষ্য বসতি তখনও গঠে ওঠেনি। এসব এলাকায় তখন বসবাস করতো জংলী মানুষের দল যাদের কাছে তখনও সভ্যতার আলো পৌঁছেনি। পীর জঙগী শাহ এদেরকে শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে সভ্যতার সাথে পরিচিত করে তোলেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর অনুপম চরিত্রের মাধুর্যে মুদ্ধ হয়ে এলাকার লোকজন ইসলাম ধর্ম কবুল করে সভ্য মানুষে পরিণত হয়। এই গ্রামে তাঁর মাজারটি এখনও সেই স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হযরত পীর চাঁদ শাহ দেওয়ান (র)

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় এই দরবেশ প্রথমে রাজ কর্মচারী হিসেবে বর্তমান পান্টি ও চাঁদপুর এলাকার প্রসাসিনিক দায়িত্ব নিয়ে এখানে আগমন করেন। তিনি অতিশয় বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের পাশাপাশি তিনি এলাকার মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচারে ব্রত হন। দীর্ঘদির এখানে শাসন কাজের পাশাপাশি ইসলাম প্রচারে আত্মনিবেদিত এই কামিল পুরুষের মৃত্যু এখানেই ঘটে বলে জানা যায়। তাঁর মাজারটি বর্তমানে একটি বড় বট গাছের নিচে চাপা পড়ায় সহজে দৃষ্টিগোচর না হলেও একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়। তাঁর নামানুসারে বর্তমান ইউনিয়ন চাঁদপুরের নামকরণ হয়েছে বলে জানা যায়।

মীর রুহুল্লাহ (র)

মুঘল বাদশাহ্ শাহ্ আলমের সময়ে হযরত শাহ্ রুহুল্লাহ্ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে দিল্লী থেকে বাংলাদেশে আসেন। তিনি কুমারখালীর এদরাকপুর অঞ্চল ইসলাম প্রচারের জন্য বেছে নেন। তিনি দীর্ঘদিন অত্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের পর এখানেই মৃত্যুবরণ করেন এবং এখানেই শেষ নিঃশাষ ত্যাগ করেন। এখানে তালোয়ায় তাঁর মাজার স্থাপিত হয় যা তালোয়ার মাজার নামে এলাকায় বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দরবেশ সোনাবন্ধু

কুমারখালী শহরের বাজারের পাশেই সোনাবন্ধুর মাজার অবস্থিত। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু তথ্য পাওয়া দুস্কর। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার তাঁকে হিন্দু হিসেবে পরিগণিত করেছেন। তাঁর মতে সোনাবন্ধু অদ্বৈত বংশে সীতাদেবীর গর্ভে

জন্মলাভ করেন।[১০] কিন্তু তাঁর ঐ মত সঠিক নয় বলে অনেকে মনে করেন। কুষ্টিয়ার ইতিহাস ও কুষ্টিয়া জেলা ইসলাম গ্রন্থের রচয়িতা শ ম শওকত আলী বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে সেনাবন্ধু যে মুসলমান ছিলেন তা প্রমাণের প্রয়াস চালিয়েছেন।[১১] খন্দকার আব্দুল হালিম আরও পরিষ্কার করে সোনাবন্ধুর পরিচয় সম্পর্কে তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন-

সোনাবন্ধু রাজবাড়ী জেলার মধুখালীতে আরব থেকে আগত সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি পরবর্তীতে কুমারখালী চলে আসেন।

১৮৬৭ সালে তিনি আশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন বলে জানা যায়। সোনাবন্ধু ইন্তেকাল করলে তাঁকে মুসলিম শরিয়াহ মতে দাফন করা হয়। কেরামত ফকির নামে জনৈক কামেল ব্যক্তি।[১২] তাঁর মাজারটি সংস্কার করে দেন এবং জীবদ্দশায় তিনি নিজেই এই মাজারের দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করে যান। এটাও সোনাবন্ধুর মুসলমান হওয়ার প্রমাণ বহন করে বলে অনেকে মনে করেন।[১৩] ♦

তথ্যসূত্র :

১. বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব, ডক্টর আ ন ম রইছ উদ্দীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা- ২৭ বর্ষ- ২য় সংখ্যা, পৃ- ১৬৭। তারা চাঁদ এর সূত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন।

২. পূর্বোক্ত

৩. সাবা বংশের নামানুসারের সাবা শব্দের সাথে উর শব্দটি যোগ করে এই নামকরণ করা হয়। 'উর' শব্দের অর্থ 'শহর। সুতরাং সবাউর শব্দের পুরো অর্থ দাঁড়ায় সাবাদের শহর

৪. বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৬৭

৫. পূর্বোক্ত, পৃ- ১৬৭

৬. পূর্বোক্ত, পৃ- ১৬৭

৭. সিয়াম ভারত ও চীনের মধ্যে সমুদ্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে বন্দর হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এর বর্তমান স্থাস বা পরিচিতি সম্পর্কে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া মুশকিল।

৮. বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৬৭

৯. Wikipedia, Islam in India.

১০. কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, মাতৃমহিমা, কুমারখালী, ১৩২৮

১১. শ ম শওকত আলী তাঁর কুষ্টিয়া জেলায় ইসলাম প্রচার গ্রন্থে লিখেছেন, 'সোনাবন্ধু হিন্দু ছিলেন না। তিনি হিন্দু হলে মুসলমান বাড়িতে রাখান থাকতেন না এবং মুসলমান সোনাউল্লাহর শিস্যও হতেন না। তাই তিদনি মুসলমান ছিলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৫, পৃ-২৩

১২. তিনি একজন ইসলাম সংস্কারক ছিলেন। জেলায় বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কার এবং মাজার সংস্কারে তাঁর ভূমিকা লক্ষ করা যায়।

১৩. ডা. আব্দুস সাত্তার খুশী, তেবাড়ীয়া, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

বঙ্গরত্ন শেখ হাসিনা

সোহরাব পাশা

তোমার নামে জেগে উঠেছে
স্বপ্ন হারানো সব মানুষ
নতুন আলোর জামা পরে ক্ষিপ্র অন্ধকার থেকে
খালি পায়ে ছুটে আসে উৎফুল্ল রোদের সকাল,
হেসে ওঠে যারা দীর্ঘরাত হিংস্র দুঃস্বপ্নে কাতর
ঘুমুতে পারেনি বুনো রাত্রির ভেতর;

তুমি বিনম্র শোকার্ত হাতে দুঃখকে করেছো মুঠোবন্দি,
বিষাদের মেঘ সরিয়ে সোনারোদে ছড়িয়ে দিয়েছো
জীবনের দ্যুতিময় ঋদ্ধ প্রণোদনা–আনন্দের কোলাহল,

বাংলাদেশ ভুলে গেছে অভাবের বিষণ্ন সংস্কৃতি
সে তো তোমারই জন্যে;
কাঠের লাঙল ফেলে কৃষক নিয়েছে হাতে আজ প্রযুক্তির
সোনালি বোতাম– সেও তোমারই জন্যে

বাংলাদেশ বাংলাভাষার বিখ্যাত মৌলিক কবিতা
যা লিখে দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
আর তুমি অক্লান্ত বিনিদ্র পাঠ করছো ব্যাকুল
দীর্ঘশ্বাসে, প্রাণের অধিক প্রিয় বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের
খোলা জানালায় ছড়িয়ে দিয়েছো আলো

বিশ্বও জেনেছে আজ তোমার কী উজ্জ্বল সৃজনের স্বপ্নভাষা
পদ্মা সেতুর গ্রীবায় স্বরচিত জ্যোতির্ময় তোমার স্বাক্ষর
যা অম্লান থাকবে দূর মহাকালেও,

বঙ্গরত্ন, তুমি বাংলাদেশ আর বাঙালির দীপ্র অহঙ্কার।

আঁধারের সিঁড়ি ভেঙে

খালেক বিন জয়েনউদদীন

তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে অসীম আকাশে নিতে পারো
দিতে পারো সুফলা জমি, পাল তোলা নৌকা ও জোছনা।

তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে পাহাড়ে নিয়ে যেতে পারো
দেবদারুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে সৃষ্টির গান শোনাতে পারো
তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে বিস্মৃতির স্মৃতি জাগাতে পারো
ঝরের রাতে ডানাভাঙা হরিয়ালের ছায়া দেখাতে পারো।

আমি শেষ বিকেলের যাত্রী, প্রচ্ছন্ন অভিমানে দাঁড়িয়ে
তোমার ইচ্ছের কথা ভাবছি, আর সমুদ্রের ঢেউ গুনছি
কখন উঠবে শিরীষের মাথায় চাঁদ, আকাশভরা নক্ষত্র
দুগ্ধবর্ণ বাতাসে ছড়াবে সবুজ শস্যের সুঘ্রাণ
অপেক্ষায় আছি, পঁয়ষট্টি বছর আঁধারের সিঁড়ি ভেঙে।

কবিতার যাত্রা
আনোয়ার কবির

আমার কবিতা ছাড়িয়ে যেতে চায় আমাকে
শিষ্য যেমন গুরুকে, ছাত্র শিক্ষককে, সন্তান বাবাকে

কবিতার অন্তর্মুখি যাত্রা
খোলস ছাড়তে ছাড়তে নিরবধি বয়ে যায়।

শিল্পোত্তীর্ণ কালোত্তীর্ণ তকমা গায়ে দিয়ে
জলের মতো গড়াতে গড়াতে
বাতাসে ফানুসের মতো ভেসে রয়।

নিজেকে নিজে ছাড়িয়ে আকাশের সমান উঁচুতে
মেঘে ঢাকা সোনালি রং
ঘুরে ফিরে একই রয়ে যায়।

সুখ দুঃখ অন্তর্মুখি বহির্মুখি কবিতা
নিজেকে নিজে ছাড়িয়ে যায়!

নীরব নিথর গানের পাখি

মিলন সব্যসাচী

আঁধার রাতে নিভে গেলো কিশোর আলোর দীপ
তার কপালে কে পড়ালো রক্তে রাঙা টিপ
শান্তির শ্বেত পায়রাগুলো কেনো যে পুড়ে যায়
এমন কতো প্রশ্ন পাহাড় দীর্ঘশ্বাসে উড়ে যায়।

অশ্রুভেজা ভোরের বাতাস স্বপ্নবিহীন মাঠ
ফোটার আগেই ঝরে গেলো স্বপ্নকুঁড়ির পাঠ
পাখির কণ্ঠে নেই কলবর থমকে গেছে গান
রাতের ঝরা রক্তজবার করুণ অভিমান।

গানের পাখি নীরব নিথর নীলচে রঙা মুখ
মাতৃক্রোড়ে শান্তির নীড়ে খুঁজবে না আর সুখ
পাই না খুঁজে খেরার সাথী কার কাছে যে কই
সবুজ ঘাসের সাদা কষ্টে পাথর হয়ে রই!

আমাদের এই জন্মভূমি মায়ের মতো দেশ
ব্যথার শ্রাবণ তবু জাগায় ভয়াল রাতের বেশ
কখন যেনো কী হয়ে যায় ভয়কে করি জয়
কে দিবে এই প্রশ্নের জবার এমন কেনো হয়?

ঘৃণ্য-ঘাতক উল্লাসে ওই রক্তে রাঙায় হাত
আসে নাকো কাঙ্খিত ভোর পোহায় নাতো রাত
ঝিলের জলে হাসে না আর শুভ্র শতদল
ভাঙা ডানার হাসগুলো কী করবে কোলাহল?

চৈত্র রোদের দিন ফুরালে হাসে মলিন ঘাস
শ্রাবণ এ কোন তৃষায় কাতর বুকে দীর্ঘশ্বাস
কার বেদনায় রক্তবৃষ্টি ঝড়ে পড়ে টুপ
কোথায় কবে কে দেখেছে প্রকৃতির এই রূপ?

জল-তরঙ্গে নাচে না আর মধুমতির তীর
আকাশটা ওই পড়ছে নুয়ে অবনত শির
আজ আকাশে কেনো এতো নীল বেদনায় ঢেউ
সবার আছে প্রশ্ন আমার বলতে পারো কেউ?

শেখ হাসিনার জন্মদিন

খান-চমন-ই-এলাহি

তোমার স্বদেশপ্রেমের ভাষায় বিমুগ্ধ জনগণ
শিল্পীর ক্যানভাসে আঁকে মুজিবের বাংলাদেশ।

তুমি চিরন্তন সাহসের নাম
তোমার কীর্তিগাথা দেশকালের সীমানা ছেড়ে
দূর বহুদূর, দিগ্বিদিক, দেশ-দেশান্তরে
কখন পৌছে গেছে কেউ জানেনা, যদি জানতো
বাতাস বলে দিতো
ঢেউ বলে দিতো
জোছনা বলে দিতো
বলে দিত আগুন, দিনের সূর্য, ফুলের সুবাস;
কেউ বলেনি কখন কীভাবে পৌঁছলে তুমি
মুজিব ভক্তের অন্তরে অন্তরে
তাহলে তুমি সেই সত্য-যার অপেক্ষায়
বেগম মুজিবের অভূতপূর্ব প্রার্থনা
রাত্রির অন্ধকার শিকল ভেঙে দিনের জন্য জাগরণ
আহা, কী সুন্দর তোমার নাম-
হাসিনা! শেখ হাসিনা! মুজিবতনয়া!
তোমার জন্মদিন
শরতের উদার আকাশ হয়ে ফিরে আসে বার বার
বাংলা ও বাংলাদেশের স্বাধীন জমিন জুড়ে।

মায়ের কোন কবিতা হয় না

আসাদুল্লাহ

সমুদ্রটা দেখেছি ডুব দিয়েছি কতবার
স্নিগ্ধ শিক্ত শিতল আদরে, আমি তার
গভীরতা সন্ধান করে পাইন; না কোন বিজ্ঞানী
সে কি বৃক্ষ ? সিদরাতুল মুনতাহার মতো
সর্বোচ্চ সীমার মহিমায় ব্যাখ্যাতীত; তার
সেই প্রশান্ত আশ্রয় দুনিয়ার জান্নাত জেনেছি;
ছায়াহীন বিধাতার সুশীতল প্রচ্ছায়া বুঝেছি;

সে এক পাহাড় যার উচ্চতার কাছে এভারেস্ট
পায়ের তলার ঘাস; জ্যামিতি বা
পরিমিতি বিদ্যার কোন সূত্রেই তার উচ্চতা নির্ণেয় নয়,
মুখের চেহারা তার চিরায়ত শান্তির জান্নাত
ভুরু জোড়া প্রজাপতি, চির অমলিন তার দৃষ্টিদল
মুখমণ্ডল-নক্ষত্র অনিঃশেষ তাপালোর গোলা;

মায়ের কোন কবিতা হয় না সব তার কবিতা

নিরস সময়গুলো

ফারুক হাসান

আমাদের নিরস সময়গুলো অবলিলায়
চলে যাচ্ছে, শরৎ এর দিন। হিম পরশে ধোয়া আকাশ
পাতা ঝরার কান্না।
জীবন কী বহতা নদীর মতো। শুধু কী
বয়ে চলা।

একাকী হাঁটছি তো হাঁটছি,
পুরনো গুহার ভেতর দিয়ে
মহেঞ্জদাড়ো হরপ্পা ইতিহাস যেনো
আজ জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে।

স্মৃতির বিষাদ

মুহাম্মদ আবদুল্লাহিল বাকী

শরতের বাতাস স্তম্ভিত ঠেক খেয়ে আছে
ঝরে পড়া শিউলি ফুলের গায়ে
আমি নদীর কাছবরাবর খোঁজ করি
ভাঙা চাঁদের আলো-অবন পল্লীর
লাল রাস্তা কংক্রিটে সেজেছে, হারিয়ে যাচ্ছে
পলাশ, খোয়াই আর বুনো পথগুলো
এখন আলোর দেশ থেকে ঘন হচ্ছে অন্ধকার
জলজ পতঙ্গের মত মোটরবাহিত হয়ে
ছুটে যাচ্ছে এদিক ওদিক যুবকের দল, পূর্বপল্লীর
শান্ত নিস্তব্ধতার হীরামন পাখির ডাক
গাছগাছালির ফাঁকে কেবল এখনও জেগে আছে
এখানে হেমন্তের মৃদু আভাস ঘাসের আগায়
লাফিয়ে নেমেছে চাঁদ শিশিরের মুক্ত বিন্দুর সাথে
অদ্ভুত উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে বিনুনী বাঁধছে
সময়ের রুদ্র জটাজাল, মায়াবী হরিণ
পাক খাচ্ছে সময়ের গভীর অরণ্যে
এই পালটে যাওয়া অস্থিরতা ছাপিয়ে
বৃশ্চিকের মত রোদ মেঘের আড়ালে সূর্যাস্তের
রঙবদল প্রত্যক্ষ করছে-হারিয়ে যাওয়ার
গভীর শব্দ ছবির ও কবিতার শূন্য অহংকার
নিয়ে পড়ে আছে এক স্মৃতির বিষাদে।

ট্রেনে যেতে যেতে

দেলোয়ার হোসেন

আজ পনের বছর ধরে শশ-তুল্য একটা লোকের ঘর করতে-করতে সুমনা নিজেই অনেকটা সেরকমই হয়ে গেছে। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে টিকিট নিয়েছে আরজু। কম্পার্টমেন্টের ভেতরটা বেশ চক্‌চক করছে। নোঙরা পর্দাগুলোর বদলে পরিষ্কার পর্দা দু'পাশে গুটিয়ে বাঁধা। সুমনা বেশ আরাম করে বসেছে। বাতাসে হালকা শীতের আমেজ। লাল টুক্‌টুকে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে পা দুটো সিটের উপর তুলে নিয়েছে। খোলা জানলা পথে তাকালো সুমনা। আরজু হালকা দৌড়ের মতো ছুটে আসছে। ওর হাতে অনেকগুলো খবরের কাগজ।

সুমনা ভ্রু কুঁচকায়। ট্রেন ছাড়তে এখনও দশ মিনিট বাকি। এতো ব্যস্ত হওয়ার কি আছে। সকালে দু'তিনটা পত্রিকা চা খেতে-খেতে গিলেছে আরজু– এখন আবার নতুন কিছু পত্রিকা না হলে তার সময় কাটবে না। রাতের ট্রেন, একটু গল্পে-গল্পে সময় পার করবে তা- নয়। এসেই চোখ ডুবাবে পত্রিকার পাতায়।

দু'তিনটা ল্যাগেজ। খাবারের ব্যাগ, পানির ব্যাগ সব নিজেদের সিটের সিমানার মধ্যে উপর-নীচে যত্নে রাখা। চারপাশটা দেখে নিয়ে সুমনা সামনের সিটের দিকে তাকায়। একজন প্রায় ষাট বছরের বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা বসে আছেন উল্টোদিকের জানালায়। সঙ্গে তার চেয়ে দু'তিন বছরের বড় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। ভারি সৌম্য চেহারা। নীল্‌চে কডের প্যান্ট এবং ফুলহাতা পুলওভারে দেখাচ্ছেও ভারি সুন্দর। খয়েরি রঙয়ের চশমার ভেতর দিয়ে দুটো মায়াময় চোখ ছুঁয়ে আছে সঙ্গের ভদ্র-মহিলাকে। ওনারা হয়তো স্বামী-স্ত্রী। দু'জনকে দেখে সুমনার মনে হলো ওরা হয়তো একে অন্যের জন্যই পৃথিবীতে এসেছে। মন দিয়ে ভদ্র মহিলাকে দেখে সুমনা। মাথায় কাঁচা-পাকা চুলের বাগানের মাঝখান দিয়ে সরুপথ চলে গেছে মাথার শেষ সীমানায়। পেস্তা রংয়ের সিল্ক শাড়ির উপর বাদামী রংয়ের শাল জড়ানো, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। ভদ্রলোক বড় ব্যাগ থেকে দুটো হালকা বালিশ বের করে গুজে দিলেন ভদ্র-মহিলার পিঠের নীচে। ভদ্র-মহিলা একটু নড়ে-চড়ে জুত হয়ে বসলেন।

পা দুটো একটু ছড়িয়ে দাও মনিরা, দেখবে ভালো লাগছে। বললেন বটে কিন্তু নিজেই স্ত্রীর পা-টা ধরে মেলে দিলেন ভদ্রলোক। এবার খানিকটা অসস্থি নিয়ে ভদ্র-মহিলা তাকালেন সুমনার দিকে। হেসে ফেললেন তিনি। কি কান্ড করনা তুমি– আমি কি নিজে কিছুই করতে পারি না! মিষ্টি হেসে চোখ সরিয়ে নেয় সুমনা। ব্যাগ থেকে ম্যাগাজিনটা বের করে।

আরজু একখানা কাগজে চোখ ডুবিয়ে বসে আছে। তার যেনো আর কিছুই বলার নেই, কিছু করারও নেই। অসহ্য লাগে সুমনার। ট্রেনটা লম্বা হুইসেল দিলো। একনই ছাড়বে। নড়ে উঠলো ট্রেন। জানলা পথে বাইরে তাকায় সুমনা। ধীরে-ধীরে পেছন দিকে সরে যাচ্ছে দোকানপাট, লোকজন ভরা প্লাটপর্ম। হঠাৎ দম বন্ধ হবার যোগার হয় সুমনার। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে পড়ি-মরি করে দৌড়াচ্ছে জানালার পাশ দিয়ে। ইসঃ বড্ড দেরি করে ফেলেছে ওরা। যদি উঠতে না পারে তা'হলে...। একটা চাপা টেনশন অনুভব করে 'ও'। এরকম করে ট্রেন ধরা কি চারটে খানেক কথা! টেনশন নিয়ে সামনের প্যাসেজে তাকাতেই হ্যা হয়ে যায় সুমনা। সেই ছেলেটা আর মেয়েটা। ওরা এই কম্পার্টমেন্টেই উঠেছে। এদিকেই আসছে। কি সুন্দর হেসে-হেসে ছেলেটার গায়ে ঢলে পড়তে-পড়তে এগিয়ে আসছে মেয়েটা। ছেলেটা ওকে জাপটে ধরে আছে। দু'জনেই জিন্স সেপার্টস শ্যু। দু'জনের কাঁধেই বেশ বড় ব্যাকপ্যাক।

ছেলেটার ডান হাতে একটা মাঝারি ব্যাগ রয়েছে। পানির বোতল, খাবার-টাবার হবে হয়তো। মনে-মনে ভাবে সুমনা। সিট এবং সিটের পাশে ঝুলানো

পর্দাটা দেখে মেয়েটার দিকে বিশেষ একরকম দৃষ্টিতে তাকালো ছেলেটা। ক্ষণিকের দৃষ্টিপাতে ঠিক বোঝা গেলো না বিষয়টা। তবে, মুহূর্তে মেয়েটার গালে, চোখে লজ্জামাখা হাসির উদ্ভাস দেখে সেরকমই মনে হলো সুমনার। ভাবলো, ঐ সিটটা যদি আমাদের হতো। ওটাতে প্রাইভেসি অনেক বেশি। একটা ঢেউয়ের মতো হালকা আফসোস ছড়িয়ে পরে সুমনার মনে। বিপরীত ঢেউয়ের ধাক্কায় সে ভাবে, ধুস– এখন বিয়ের চৌদ্দ বছর পর আবার প্রাইভেসি। তাও আবার আরজুর সঙ্গে। ওতো খবরের কাগজ পড়বে। তার চেয়ে এই ভালো আছি।

মেয়েটা পা ঝুলিয়ে সিটে বসে। ছেলেটা কাঁধ থেকে ব্যাগপ্যাকটা খুলে নেয়। নাও, এবার আরাম করে বসো।

আরাম? আঙুল নেড়ে বলে মেয়েটা, আরাম হারাম হয়ে গেছে।

তাই নাকি? সকালবেলা একথাটা মনে থাকে না কেনো? তখন উঠতে বললেই তো 'উ'-হু। ছেলেটা সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটার লম্বা বেণুনীতে আস্তে টান দেয়।

নো ওতু, ডন্ট পুল মাই ল্যেগ। লাস্ট বারদিন ধরে আমি সকালে উঠে যাচ্ছি।

শ্বশুর বাড়িতে সব মেয়েরাই অমন উঠে থাকে। এবার তো সাতদিন ধরে তার শোধ নেবে।

নেবোই তো। যতো বেড-টি আমি এ কদিন তোমায় খাইয়েছি, তার থ্রি টাইমস ওসুল করতে হবে।

শুধুই বেড টি? আরো কতো কি খাইয়েছো। আমি সব শোধ দিতে রাজি। শেষের কথাটা মেয়েটার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলে ছেলেটা। সঙ্গে-সঙ্গে একটা হালকা হাসির সঙ্গে কাঁচের চুরির রিনঝিন শব্দ ভেসে আসে। চোখ পাকায় মেয়েটা। খুব অসভ্য হয়ে গিয়েছ তুমি।

ম্যাগাজিন হাতে বসে ছিলো সুমনা। পড়তে পারেনি এক বর্ণও। ওদের কথা শুনছিলো। কি সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে ছেলেটি আর মেয়েটি। কতো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কতো কথাই না বলা যায়– ভাবে সুমনা।

মনে হয় ওরা হানিমুনে যাচ্ছে। মেয়েটার জিন্স প্যান্ট, হাতে কাঁচ গালার চুড়ি। দু'হাতের পাতায় মেহেদীর কারুকাজ। বড়-বড় নখ, গাঢ় গোলাপি রঙে রাঙানো।

খুব ফর্সা নয় মেয়েটা। কিন্তু ভারি মিষ্টি মুখখানা। একটু চাপা নাকের সঙ্গে বড়-বড় ভাসা-ভাসা চোখ। সেই চোখে নতুন বিয়ে হওয়া সুখ আর আনন্দের ছটা। এরকম সাজ সবার না মানালেও এই মেয়েটিকে একটুও খারাপ লাগছে না।

সুমনা আর চোখে দেখে আর দেখে। মেয়েটা ছেলেটার কাঁধে মাথা হেলিয়ে অনবরত বক-বক করেই যাচ্ছে।

সামনের বৃদ্ধ ভদ্রলোক তেল জাতীয় কিছু একটা ম্যাসেজ করছেন ভদ্রমহিলার পায়ে। একটা পা কোলের উপর রাখা। মনে হয় ওর পায়ে প্রবলেম আছে। সুমনাকে তাকাতে দেখে একটু হাসলেন ভদ্রলোক। মহিলা নড়ে চড়ে বসেন।'অনেক হয়েছে। এবার ছারো তো দেখি'।

না– আর একটু স্থির থাকো। ডাক্তার বলেছে দিনে তিনবার মালিস নিতে। তারপর ভদ্রলোক বাস্কেট থেকে ফ্লাক্স বের করেন। ছোট্ট দু'টি সুদৃশ্য গ্লাস। কফি ঢেলে এগিয়ে দেন মহিলার দিকে। নিজেও একটা চুমুক দিয়ে হাসেন ভদ্রলোক। 'ভাবছো কেনো মনিরা, তোমার পা যদি অকেজো হয়েই যায় তখন এই আমি তোমাকে বয়ে বেড়াবো।

'কি আমার বীর পুরুষরে!' খোড়া বৌকে ঘাড়ে নিয়ে না ঘুরলে তোমার চলবে কেন! ভারি একটু মিষ্টি ঝঙ্কার দেন মনিরা। এসব দেখে ভীষণ ভালো লাগে সুমনার। এমনটি যাদের হয় তাদের প্রথম থেকেই হয়ে যায়। বাকিটা হলো ধরে রাখা। তার জন্য চাই পারস্পরিক অপার ভালোবাসা মমত্ববোধ। ওঁদের দেখতে-দেখতে মনটা ভালো হয়ে যেতে চায় সুমনার।

ট্রেনে উঠে এ পর্যন্ত চুপ করেই বসে আছে আরজু। লোকটার কোনো হুসই নেই যে, সঙ্গে আরো কেউ রয়েছে। রাতের ট্রেন– খাওয়া-দাওয়ার কোনো ঝক্কি নেই। ছোট ব্যাগটায় ফ্লাক্সে কফি এনেছে সুমনা। ওদের দেখাদেখি তারও ইচ্ছে করে কফি খেতে একটু গল্প করতে। আরজু বসে আছে দু'হাত দূরে। যেনো পরস্ত্রীর সাথে জার্নি করছে। কাছে এগিয়ে গা ঘেঁসে বসে সুমনা। অতি সন্তর্পনে আরজুর হাত নিজের কোলের কাছে জড়িয়ে ধরে। আরজু খবরের কাগজ থেকে চোখ সরায় না একবারও। সুমনা আঙ্গুলের খোঁচা মারে আরজুর পেটে।

এই শোন না, ছোট ব্যাগটা কোথায় রেখেছ গো? একটু কফি খাবো।

উঃ দেখো না সিটের নিচে আছে।

একটা ছোট্ট নিশ্বাস বুকে চেপে উঠে দাঁড়ায় সুমনা। মাজা বাঁকা করে টেনে আনে ব্যাগটা। কফি ঢেলে এগিয়ে ধরে আরজুর দিকে। খবরের পাতায় চোখ রেখেই হাত বাড়ায় আরজু। নিজের কাপে চুমুক দেয় সুমনা। ভালোবাসা ভরা কোনো মুহূর্তই তৈরী হয়না কফি খাওয়াকে কেন্দ্র করে।

ট্রেন ছাড়ার পর থেকেই সুমনার ভিতরটা উচ্ছল হয়ে উঠতে চাইছিল। এতদিন পর হোষ্টেল থেকে ছেলেকে আনতে যাচ্ছে ওরা। সামনে শীতের লম্বা

ছুটি। কতদিন পর বাড়ি আসবে ছেলেটা। সুমনার মন ভীষণভাবে চাইছে ভিতরের ভালো লাগাটা আরজুর সঙ্গে শেয়ার করতে।

আরজুর কাছাকাছি এসে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে ঘন হয়ে বসে সুমনা। কোন প্রতিক্রিয়া নেই আরজুর।

এই শোন না, এতো কি পড়ছো? সুমনা আদুরে গলায় বলে কিছু।

নাকের উপর চশমাটা ঠেলে দিয়ে আরজু বলে, সময়টা তো কাটাতে হবে– তোমার ঘুম এলে ঘুমিয়ে পড়ো।

সময় কাটাবার আর কি কোনো কাজ নেই, ভাবে সুমনা। কাগজ পড়া আর শোয়া ছাড়া আর কিছুই বোঝে না আরজু। অসহ্য লাগে বুকের ভেতরটা। চোখ নিংড়ে অভিমানের অশ্রু এসে ভিজে দেয় চোখের পাতা।

আঙ্গুল দিয়ে চোখের জলটুকু মুছে আরজুর একটা হাত ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস করে সুমনা। ওদের দেখো না কি সুন্দর লাগছে দু'জনকে। ছেলেটার কাঁধে মাথা রেখে মেয়েটা কি যেনো দেখছে। এক ঝল্‌ক দেখে চোখ ফিরিয়ে নেয় আরজু।

দেখলাম তো।

ওদের দেখে তোমার ভালো লাগছে না?

কেন ভালো লাগবে, ওরা আছে ওদের মতো, তাতে আমাদের কি আসে যায়।

অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে সুমনা। তারপর, হতাস গলায় ধীরে-ধীরে বলে, তুমি এতো বেরসিক কেন? এবার হাতের কাগজটা ভাঁজ করে আরজু। চশমাটা মুছতে-মুছতে বলে, তুমি এখনও এতো পাগলাটে কেন? আমাদের যতেষ্ট বয়স হয়েছে, সে কথাটা ভুলে গেলে চলবে না। তারপর, উপরের ব্যাঙে বিছানাটা করে ফেলে আরজু। এগারটা বাজে– এবার শুতে হবে্।

মাস্তল ভাঙা জাহাজের ভঙ্গিতে গদিতে পিঠ এলিয়ে দিয়ে ভাবে সুমনা। একটু ঘেঁষে দুটো কথা শুনতে চাইলাম, সেটা ওর কাছে পাগলামো! ভালোবাসা চাওয়া, ভালোলাগার মুহূর্ত পেতে চাওয়া খুশি, আনন্দের প্রকাশ এগুলো সবই পাগলামি? মাত্র সাঁইত্রিশেই? তা'হলে এরা! যেভাবে বৃদ্ধ ভদ্রলোক সারাক্ষণ তার বৃদ্ধার স্ত্রীর খেয়াল রাখছেন, হাসিমস্করা করছেন, কখনও পায়ে মালিস কখনও কপাল টিপে যে কোনো ছলে স্ত্রীকে স্বযত্নে ছুঁয়ে রেখেছেন সারাক্ষণ এটাকে কি বলবে আরজু! জীবনটা শুধুই কঠিন মাটিতে পা ফেলে-ফেলে নিয়মমাফিক হেঁটে যাওয়া? আর কোনো দিন হঠাৎ অকারণ খুশিতে আকাশে উড়বে না সুমনা? সেই অধিকারও হারিয়েছে, কারণ ওর বয়স হয়ে গেছে।

গলার কাছটাতে একটা অব্যক্ত কষ্ট ডেলা পাকিয়ে উঠতে চাইছে। খানিকটা বাতাস চলে যেতে দেয় বুকের তল পর্যন্ত। তারপর, ঢক্‌ঢক করে বোতল থেকে পানি খায় সুমনা।

সামনের সিটের মহিলাও শুয়ে পড়েছেন স্বামীর কোলে মাথা রেখে। দু'খানা জরাগ্রস্ত হাত দশটি আঙ্গুল ছুঁয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে আছে পরম নির্ভরতায়। মহিলার চোখ বোজা। ঘুমিয়ে পড়েছেন কিনা বোঝা যায় না।

মাঝে-মাঝে ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে ভেসে আসছে যুগল কণ্ঠে চাপা অস্পষ্ট কথার আওয়াজ, হাসির টুকরো আর কাচের চুড়ির রিনিঝিনি। কোমড় পর্যন্ত কম্বল টেনে আধা শোয়া সুমনা তাকিয়ে আছে ট্রেনের ছাদের দিকে। একটানা তালে-ছন্দে চলছে ট্রেন্। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ-হঠাৎ বুকের মধ্যে কেনই বা জেগে উঠে বিস্তর্ণ বালিয়ারি? নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে সুমনা।

আরজু নির্ভরযোগ্য, দায়িত্বশীল, কর্মক্ষম। স্ত্রী, পুত্রের প্রতিটি প্রয়োজনের দিকে তার সজাগ দৃষ্টি। চরিত্রবান স্বামী, ফুটফুটে সন্তান, ছবির মতো সুন্দর সাজানো সংসার। তা'হলে ঠিক কোন অপূর্ণতার জন্য এতসব পাওয়ার ফাঁকে-ফাঁকেও জেগে থাকে অন্ধকার নির্ঘুম রাত। আরজু একটু রাশভারী প্রকৃতির মানুষ। নিজের আবেগ-উচ্ছাসকে নিজের মধ্যে রাখতে ভালোবাসে। সবাইতো এরকম হয়না।

ট্রেন কতো ষ্টেশনে দাঁড়ালো, কতো ষ্টেশন ছাড়িয়ে গেলো কিছুই খেয়াল করা হলো না। আরজুর ভালোবাসার অনেক কথাই মনে পড়ে যায় সুমনার। কোথায় যেনো চাপা পড়ে আছে ছোট্ট মিষ্টি রঙিন মুহূর্তগুলো।

চোখের কোনায় জমা একবিন্দু জল মুছে নেয় সুমনা। চোখ বুজতে চেষ্টা করে। এমন সময় মোবাইলে ম্যাসেজ টোন বেজে উঠে। এতো রাতে ম্যাসেজ? তাও আবার তার মোবাইলে! শুয়ে-শুয়েই মোবাইলটা চোখের সামনে ধরে। "ও আমার মিষ্টি সোনা বউ, আর রাত জেগো না লক্ষ্মীটি। এবার ঘুমিয়ে পড় আই লাভ ইউ"।

ম্যাসেজটার দিকে হত্‌বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সুমনা। আরজু উপর থেকে ম্যাসেজ পাঠিয়েছে। আরজু? ওকে ম্যাসেজ করেছে আরজু। এমন মিষ্টি আর সুন্দর ম্যাসেজ! 'ও' এতো রোমান্টিক! বারবার দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না সুমনার। মুহূর্তে সব দুঃখ, সব ক্ষোভ দূর হয়ে যায় মন থেকে। মোবাইলটা বুকে চেপে এক এক করে অজস্রো ফোঁটায় ঝড়ে সুখের মুক্ত বিন্দু।

ট্রেনের আওয়াজটা সেই একঘেঁয়ে অনুকরণটা কখন মিলিয়ে গেছে। ভারি মিষ্টি একটা ছন্দ এসে সুমনার মন ভরে দেয় মধ্য-রাতের ট্রেন জার্নি।♦

শেখ সাদির কবিতা

জাতিসংঘ দপ্তরের প্রবেশদ্বারে আদর্শবাণী বা মূলমন্ত্র

কাজী আখতারউদ্দিন

পারস্যের কবি শেখ সাদি আট শ বছর আগে যে কবিতাটি রচনা করেন, তার একটি অংশ পরবর্তীতে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদরদপ্তরের প্রবেশমুখে একটি আদর্শবাণী হয়েছে।

সাদি সুন্দর বাচনভঙ্গিতে ফারসি ভাষায় রচনা করেছিলেন:

বনি আদম

'বনি আদম আযায়ে ইয়েক দিগারান্দ
কে দার আফারিনেশ জে ইয়েক গুহারান্দ

ছো ওজভি বে দর্দ আভারাদ রুজেগার
দেগার ওজভাহা রা রামানাদ ঘারার
তু কাজ মেহনত দিগরম বি ঘামি
নাশায়েদ কে নামাত নাহান্দ আদমি '
উপরোক্ত কাব্যাংশটির আক্ষরিক অনুবাদ বাংলায়–
'আদম সন্তানরা একে অন্যের অংশ
তাদেরকে একই উৎস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে
যদি কখনও একটি অঙ্গে আঘাত লাগে
(তখন) অন্যান্য অঙ্গ শান্ত থাকতে পারে না।
আপনি যদি অপরের দুঃখে সাড়া না দেন
তাহলে আপনি মানুষ নামের যোগ্য নন।

কবিতটির বিভিন্ন ভাষ্য বা পেয়কার:

'ইয়েকদিগার' অর্থাৎ 'একে অন্যের' শব্দটিসহ উপরোক্ত ভাষ্যটি সাধারণত ইরানে উল্লেখ করা হয়। এই ভাষ্যটি সম্পাদনা করেছিলেন প্রখ্যাত লেখক এবং ইরানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ফারুকী। এই কথাগুলো নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ২০০৫ সালে একটি গালিচায় বোনা হয়েছে এবং ২০১০ সালের ১০০,০০০ রিয়ালের নোটের উল্টোপিঠেও রয়েছে। ১৯ শতকের ইরানি কবি হবিব ইয়াঘমাইএর মতে কবিতাটির এই ভাষ্যটিই আদি পান্ডুলিপিতে রয়েছে, যার তারিখ *গুলেস্তান* কাব্যগ্রন্থটি রচনার ৫০ বছরের মধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে।

তবে কোন কোন পুস্তকে লেখাটি একটু অন্যরকম দেখা যায়, *বনি আদম আজায়ে ইয়েক পেকারান্দ* (অর্থাৎ আদম সন্তানেরা একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ)। আর এই ভাষ্যটিই নিচের হাদিসটির বেশ কাছাকাছি বলা যায়। অধিকাংশ ইংরেজি অনুবাদে এটিই অনুসরণ করা হয়।

একটি অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক হোসেইন. ওয়াহিদ দস্তরজি:
আদম সন্তানেরা একই দেহের অঙ্গ, যা বলা যায়;
কেননা ওরা একই মাটি থেকে সৃষ্ট।
একটি অঙ্গে যদি আঘাতে যন্ত্রণা হয়,
তাহলে অন্যান্য অঙ্গেও তীব্র যন্ত্রণা হয়।
তুমি যদি মানুষের কষ্টে সাড়া না দাও,
তবে তুমি 'মানুষ' নামের উপযুক্ত নও।

আরেকটি অনুবাদ এসেছে আলি সালামির কাছ থেকে:

মানুষ আসলে একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ;
কেননা , মানুষকে একই আত্মা আর বীজ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
যখনই একটি অঙ্গ যন্ত্রণায় কাতর হয়,
তখন অন্যান্য অঙ্গও যন্ত্রণা অনুভব করে।
মানুষের দুঃখবেদনার প্রতি যে সমব্যথী নয়,
তাকে আর মানুষ বলা যায় না।
রিচার্ড জেফরি নিউম্যানের ভাষ্যে:
সকল নারী ও পুরুষ একে অপরের
একটি মাত্র দেহের অঙ্গ; সকলকেই নেওয়া হয়েছে
প্রাণের ঝিকমিক করা নির্যাস , ঈশ্বরের নিখুঁত মুক্তা থেকে;
এবং কারও প্রাণে যখন আঘাত লাগে, যার অংশিদার আমরা সবাই,
তখন সবাই সেই আঘাতের অংশিদার হয়, যেন এটা সবারই নিজস্ব বেদনা।
তুমি যদি অপরের যন্ত্রণা অনুভব না কর,
তবে তুমি মানুষ নামের অধিকার থেকে বঞ্চিত হও।

জাতিসংঘের প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল বান কি মুন একবার তেহরানে বলেছিলেন: ' জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ঢোকার মুখে একটি জমকালো গালিচা রয়েছে– আমার মনে হয় ইরানের জনগণের কাছ থেকে উপহার পাওয়া জাতি সংঘের দেয়ালে ঝুলানো এই গালিচাটি এযাবত জাতিসংঘের সংগ্রহে সবচেয়ে বড় কার্পেটা। এর উপর পারস্যের মহান কবি শেখ সাদির একটি কবিতার চমৎকার কতগুলো শব্দ বোনা রয়েছে:'

সকল মানব একই কাঠামোর অঙ্গ,
যেহেতু এগুলো সর্বপ্রথম একই নির্যাস থেকে উদ্ভূত।
(তাই) কখনও একটি অঙ্গ ব্যাথায় কাতর হলে
অন্য অঙ্গগুলো শান্ত থাকতে পারে না।
তুমি যদি অপরের দুঃখ অনুভব না কর
তাহলে তোমার নাম মানুষ নয়।

ইরানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাতিসংঘে ইরানের রাষ্ট্রদূত, মোহাম্মদ আলি জরিফের মতে এই গালিচাটি ২০০৫ সালে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সভাকক্ষে টাঙ্গানো রয়েছে।

শেখ সাদি

শেখ সাদির (১২১০-১২৯২) পুরো নাম আবু মোহাম্মদ মুসলিহউদ্দিন আবদাল্লাহ শিরাজি, তবে তিনি সাধারণত শিরাজের সাদি নামেই পরিচিত। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের পারস্যের একজন প্রধান কবি এবং গদ্য লেখক। তাঁর রচনাকর্মের বৈশিষ্ট্যমূলক গুণ এবং তাঁর সামাজিক এবং নৈতিক চিন্তার গভিরতার কারণে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। চিরন্তন সাহিত্যিক ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে শেখ সাদি সারা বিশ্বে বিপুলভাবে পরিচিত। যার কারণে তিনি পারস্যের পণ্ডিতদের মধ্যে ওস্তাদ বিবেচিত হন। পাশ্চাত্যেও তিনি বিপুলভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। *দি গার্ডিয়ান* পত্রিকার মতে তাঁর রচিত বুস্তান বইটি সকল যুগের ১০০ টি সেরা বইয়ের একটি হিসেবে বিবেচিত।

সাদি বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামক বিজ্ঞান, আইন, সরকার পরিচালনা, ইতিহাস, পারস্য সাহিত্য এবং ইসলামিক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। এতে মনে হচ্ছে এখানে পড়াশুনা করার জন্য তিনি বৃত্তি পেয়েছিলেন। তাঁর রচিত গুলিস্তান মহাকাব্যে তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি ইসলামি পণ্ডিত আবুল ফারাজ ইবনে আল জাওজির অধীনে অধ্যয়ন করেছিলেন। এসব স্থান তিনি যা যা দেখেছিলেন, সেসবের বিবরণ তিনি তাঁর লেখায় তুলে ধরেন।

বুস্তান ও গুলিস্তান গ্রন্থে সাদি তাঁর সফরের বিভিন্ন ছোট ছোট সত্য ঘটনার কথা তুলে ধরেছেন। মোঙ্গলরা যখন খাওয়ারেজম এবং ইরানে হামলা করে, তখন যে অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তার কারণে তিনি পরবর্তী ত্রিশ বছর আনাতোলিয়া, সিরিয়া, মিসর এবং ইরাকের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ান। তিনি তাঁর

লেখায় মিসরের আল-আজহারের কাজি এবং মুফতি, বিশাল বাজার, সংগীত এবং চিত্রশিল্পের কথাও তুলে ধরেছিলেন। হালাবে তিনি একদল সুফির সাথে যোগ দিয়ে ক্রুসেড যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। অ্যাকরে ক্রুসডাররা তাঁকে বন্দী করেছিল এবং সেখানে একজন দাস হিসেবে সাত বছর দুর্গের বাইরে পরিখা খনন করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তিতে মামলুকরা মুক্তিপণ দিয়ে অন্যান্য মুসলিম বন্দীর সাথে তাঁকেও ক্রুসেডারদের কাছ থেকে মুক্ত করেছিলেন। এছাড়া তিনি জেরুজালেমও সফর করেছিলেন এবং মক্কা ও মদিনায় তীর্থযাত্রা করেছিলেন

বনি আদম

শেখ সাদি সিরাজি রচিত বনি আদম-'আদম সন্তান' একটি বিখ্যাত কবিতা। প্রবচন বা সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভ বাণী রচনার জন্য সাদি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে গুলিস্তান কাব্যগ্রন্থের বনি আদম কবিতা। কবিতাটিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে মানুষের মধ্যেকার সকল বাধা ভেঙ্গে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কবিতাটির প্রথম লাইনটির তরজমা উদ্ধৃত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পারসিক নববর্ষে–নওরোজের দিন ২০০৯ সালের ২০ মার্চ একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন। হাতে বোনা একটি বিরাট কার্পেটে কবিতাটি খোদাই করে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সভাকক্ষের দেয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে।

শেখ সাদির উপরোক্ত কবিতাটি মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার অন্তর্নিহিত অর্থের সাথে খাপ খেয়ে যায়। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর প্যারিসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে উপরোক্ত ঘোষণার প্রথম অনুচ্ছেদটি এভাবে লেখা ছিল:

'সকল মানুষ সমঅধিকার এবং মর্যাদাসহ মুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। সকলেই জন্মসূত্রে বিচারবুদ্ধি এবং বিবেকের অধিকারী হয়। প্রত্যেকেই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধের মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিত।'

সাদি মূলত সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভ বাণী বা প্রবচণ রচনার জন্য সুপরিচিত। যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বনি আদম কবিতাটি শেখ সাদির গুলিস্তান কাব্যগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের দশম কাহিনীর একটি অংশ। কাব্যগ্রন্থটি ১২৫৮ সালে সম্পূর্ণ হয়েছিল। কবিতাটির শিরোনাম ছিল ' রাজার আচরণের বিষয়।' এই কাহিনীতে দেখা যায় শেখ সাদি দামেস্কের বিশাল মসজিদে জন দ্য ব্যাপটিস্টের কবরে প্রার্থনা করছেন।

তিনি তখন সেখানে অনুরুদ্ধ হয়ে একজন অজানা আরব রাজাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। ঐ রাজা সাদিকে অনুরোধ করছিলেন, তিনি যেন তার জন্য প্রার্থনা করেন, কেননা একজন শক্তিশালী শত্রুর হুমকিতে রাজা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। শেখ সাদি সেই রাজাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, তিনি যদি উচিত

শান্তির শঙ্কামুক্ত জীবনযাপন করতে চান, তবে তাঁকে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে রাজ্য শাসন করতে হবে। দুটি সংক্ষিপ্ত কবিতার মাধ্যমে তিনি তাঁর উপদেশগুলো আরো জোরদার করেছিলেন, যার দ্বিতীয়টি ছিল *বনি আদম* কবিতাটি।

কবিতাটি রচনার প্রাসঙ্গিক বর্ণনা:

দশম কাহিনী

দামেস্কের ক্যাথেড্রাল মসজিদে আমি নবী ইয়াহিয়ার কবরের মাথার দিকে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময় একজন আরব রাজা সেখানে হাজির হলেন। অন্যায়-বিচারের কারণে কুখ্যাত এই রাজা এখানে তীর্থযাত্রা করতে এসেছিলেন। কাকুতিমিনতি করে তিনি তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য আরজ করলেন।

'দরবেশ এবং ধনবান উভয়েই বা ধনি গরিব নির্বিশেষে সকলেই এই দ্বারপ্রান্তের মেঝেতে দাস

আর যারা সবচেয়ে ধনবান, তারাই সবচেয়ে দীনদরিদ্র বা কাঙাল।'

তারপর তিনি আমাকে বললেন: 'দরবেশরা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, গভীর অনুভূতিবহ এবং তাঁদের কাজে অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ হন। আপনার হৃদয়ের সাথে আমার হৃদয়কে একত্রিত করুন, কেননা আমি একজন শক্তিশালী শত্রুর কাছ থেকে হুমকি পাচ্ছি।' আমি উত্তর দিলাম: ' আপনার দুর্বল প্রজাদের প্রতি দয়া দেখান, তাহলে কোন শক্তিশালী শত্রু আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

'শক্তিশালী বাহু এবং কব্জির জোর দিয়ে
একজন গরীব মানুষের পাঁচ আঙ্গুল ভেঙ্গে দেওয়াটা পাপ।
তাকে ভীত হতে দিন, যে পতিতকে ত্যাগ করে না/ছেড়ে দেয় না
কেননা সে যদি পড়ে যায়, তাহলে কেউ তার হাত ধরবে না।
যে মন্দ বীজ বপন করে ভাল ফল আশা করে
সে ব্যর্থ হওয়ার জন্য এবং বিনা কারণে মাথা ঘামায়।
কান থেকে তুলো বের করে মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার করুন
আর যদি তা করতে ব্যর্থ হন, তবে একদিন ঠিকই শাস্তি পাবেন।'

অনেকে মনে করেন এই পংক্তিটি একটি হাদিস বা নবী মোহাম্মদের (সা.) একটি বাণি থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে

মাতালুল-মুমিনিনা ফি তাউদ্দিহিম ওয়া তারাহুমিহিম ওয়া আতুফিহিম মাতালু ল-জাসাদ: ইদা স্তাকা মিনহু উদউন তাদাইলাহু সাইরুল-জাসাদি বিস-সাহারি ওয়াল-হুম্মা।

'বিশ্বাসীদের (মুসলিম) পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ, করুণা এবং সমবেদনার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি মানব দেহের মতো। যখন দেহের একটি অঙ্গে

বেদনা হয়, অবশিষ্ট শরীর নিদ্রাহীনতা ও জ্বরাক্রান্ত হয়।' অনেকসময় এই হাদিসটি উদ্ধৃত করার সময় মাতালুল-জাসাদএর (' শরীরের মতো') জায়গায় মাতালুল-জাসাদিল-ওয়াহিদ (একটি দেহের মতো) বলা হয়।

ধারণা করা হয় যে, গুলিস্তান কাব্যগ্রন্থটিতে সরাসরি কুরআন বা হাদিস থেকে চল্লিশটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

জাতিসংঘ প্রসঙ্গ

১৯২৮ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত জাতিসংঘের পূর্বসূরি লিগ অব নেশনের ইরানের প্রথম প্রতিনিধি ছিলেন মোহাম্মদ আলি ফারুকি। ইনি সাদির রচনাকর্মের সম্পাদকও ছিলেন।

১৯২৯ সালে প্যারিসে একটি বক্তৃতায় ফারুকি বর্ণনা করেন যে, সেপ্টেম্বর ১৯২৮, জেনেভায় লিগ অব নেশনের একটি ভোজসভায় আলবেনিয়ার প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে শেখ সাদির কবিতাটি এই সংগঠনের একটি চমৎকার আদর্শবাণী হবে। আলবেনিয়া তখন অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল।

সম্ভবত তাঁর প্রস্তাবটি গৃহিত হয়নি, তবে বহুবছর যাবত ইরানে একটা জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল যে, সাদির কবিতা জাতিসংঘের সদরদপ্তরের প্রধান ফটকে খোদাই করা রয়েছে। পরবর্তীতে ২০০২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত জাতিসংঘে ইরানে স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ জাভেদ জরিফ জানার জেনেভা এবং নিউইয়র্ক– এই দুই জায়গায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তিনি এধরণের খোদাই করা কোন লিপিফলক দেখতে পাননি।

যাইহোক এই জরিফের সময়েই ইসফাহানের একটি বিখ্যাত গালিচা তৈরির কারখানার মালিক মোহাম্মদ সেইরাফিয়ান জানালেন যে, তাঁর কাছে পাঁচমিটার লম্বা এবং পাঁচ মিটার প্রস্থের একটি গালিচা ছিল, যার উপর সোনার হরফে সাদিও ঐ কবিতাটি বোনা হয়েছিল এবং তিনি এই গালিচাটি জাতিসংঘকে উপহার হিসেবে দিতে রাজি। অবশেষ ২০০৫ সালে গালিচাটি নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সভাকক্ষে টাঙ্গানো হয়েছে।♦

প্রখ্যাত তাজিক কবি লায়েক শের আলির কবিতা

অনুবাদ : গাজী সাইফুল ইসলাম

কবি লায়েক শের আলি (Layeq Sher Ali Or Loiq Sher-Ali) তাজিকিস্তানের (Tajikistan) প্রখ্যাত কবি, তবে শিরালি (Shir Ali বা Shirali) নামে সমধিক পরিচিত। বিশ শতাব্দির পার্সিয়ান বিষয়ের তাত্ত্বিক এবং মধ্য এশিয়া ও তাজিকিস্তানের বিশিষ্ট সাহিত্য ব্যক্তিত্ব তিনি। জন্ম ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে, তাজিকিস্তানের ছোট্ট গ্রাম মাজার-ই-শরীফে (এটি আফগানিস্তানের চার বৃহত্তর শহরের একটি নয়)। এটি তাজিকিস্তানের পাঞ্জাকেন্ট জেলার সুঘাট এলাকায় অবস্থিত। মূলত স্বদেশী কবি আব্দুল্লাহ জাফর ইবনে মুহাম্মদ রুদাকি দ্বারা তিনি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। এছাড়া তাঁর ওপর অনেক প্রভাব রয়েছে ফেরদৌসী, ওমর খৈয়াম ও জালালুদ্দিন রুমির। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু বিচিত্র। সচরাচর মনে করা হয় তিনি একজন আনন্দোৎফুল্লতার কবি, দুঃখ ও অশ্রুর দেখা তার কবিতায়

কদাচ দেখা যায়। তিনি বহু তাজিক মাস্টারপিস পার্সিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেছেন। ১৯৯৪ সালে তাঁর *নির্বাচিত কবিতা* এবং ১৯৯৯ সালে তাঁর *রাখ'স স্পিরিট* ইরান থেকে প্রকাশিত হয় ।

কবি লায়েক শের আলির নাম আমি প্রথম পাই ইরানে নির্বাসিত প্রখ্যাত তাজিক বুদ্ধিজীবী মির্জা শাকুরজাদার (Mirzo Shakurzoda) *তেহরান নিউজকে* দেয়া একটি সাক্ষাৎকার থেকে। তিনি তাঁর *'তাজিকস অন দ্য পাথ অব হিস্ট্রি'* বইয়ে লিখেছেন: যুদ্ধ কোনো জাতিকে ঠেলে দেয় উন্নতির সর্বোচ্চ চূড়ায়, কোনটিকে আবার মুছে দেয় পৃথিবীর আলো থেকে। তাজিকিস্তানও এমন একটি প্রায় মুছে যাওয়া দেশ ও সভ্যতা। যদিও মানব সভ্যতার ইতিহাসে তাজিকিস্তানের রয়েছে গৌরবদীপ্ত সুখ্যাতি। জাতি হিসেবে তাজিকিরা অনন্য সৃজনশীল এবং অনুসন্ধিৎসু। প্রাচ্য সভ্যতার ভিত্তি তাদের দ্বারাই স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো প্রথম সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় শাসক 'আলেসামান ডাইনেস্টি'-এর সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে যুদ্ধে তাজিকিস্তানের পতন ঘটে। আর তখনই চীনা যাযাবর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাজিকিস্তানে আসে, যারা সোভিয়েত ইউনিয়ন খণ্ড-বিখণ্ড না হওয়া পর্যন্ত সেখানে বিক্ষিপ্ত জীবনযাপন করে। আর তাদেরই কূটচালে তাজিকিস্তান ইরান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সর্বদা তাদের যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়। এর পরের বাস্তবতা অত্যন্ত করুণ যা প্যাভলবের লেখা *'রিলেটেড ফ্রম দি হিস্ট্রি অব তুর্কিস্তান'* বইয়ে বর্ণিত হয়েছে। প্যাভলবকে বলা হয়, 'দি রাশান কনকোয়ারার'। তিনি টুয়েন্টিথ সেঞ্চুরির তাজিকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন: 'আমরা এখন সাক্ষ্য দিচ্ছি, কষ্টসহিষ্ণু, ন্যায়পরায়ণ এবং মেধাসম্পন্ন তাজিক জাতিটির পুনঃঅভ্যুদয়ের। তাঁরা এখন বড় কষ্টকর জীবন-যাপন করছে। তাঁদের দারিদ্র্য আর দুর্বলতার মূল কারণ তাঁরা যুদ্ধবিধ্বস্ত। এর জন্য দায়ী চেঙ্গিস খান, তৈমুর লং এবং উজবেক শিবানি সম্প্রদায়ের নেতা মেঙ্গিস (Mangheish)।

যুদ্ধবিধ্বস্ত তাজিকিস্তানের দুর্দশার চিত্র সেখানকার বহু কবির লেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। আজ আমরা এখানে শের আলির কবিতার অনুবাদ তুলে ধরব। তাঁর সুপরিচিত একটি কবিতার অংশ নিম্নরূপ:

"আনন্দের সঙ্গে নিজেকে আমি উৎসর্গ করতে পারি
ও আমার শবাচ্ছাদন বস্ত্র ঢাকা স্বদেশ
তুমি ছিলে আমার সম্মানের ঘর
এখন হয়ে গেছ মৃত্যুপুরি...।
এখন চারপাশে ভাসমান ফেনা তোমার

বিদেশে কিংবা স্বদেশে কোথাও কেউ নেই
যে শত্রুকে পরাজিত করতে পারে...
আমরা পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছি
ঘোড়াদের লেজ অনুসরণ করে
হারিয়েছিও সব...
এমনকি উপত্যকায় এবং সমতলে।'

কবি 'লায়েক শের আলি'র কবিতা বুঝতে হলে যুদ্ধবিধ্বস্ত তাজিকিস্তানের জীবন বাস্তবতার চিত্রটি মাথায় রাখতে হবে। যেমন:

''একবার আপনি বলেছেন: 'তুমি একজন ইরানী,' এরপর বলেছেন: 'তুমি একজন তাজিক'
হয়তো সেও মরবে মূল থেকে বিচ্যুত হয়েই, যে আমাদের করেছে বিচ্যুৎ।''

২০০১ সালে তার সম্পূর্ণ রচনাকর্ম প্রকাশিত হয়েছে সিরিলিক ও ফার্স স্ক্রিপ্টে।

লায়েক শের আলি'র কবিতা

যদি তুমি

যদি তুমি আমায় হাসাতে না পারো, কাঁদিও না
সাহায্য করতে না পারো, আঘাত করো না
যদি তুমি আমায় সুখী করতে না পারো, দুঃখের কথা স্মরণ করিয়ে দিও না
যদি আনন্দ দিতে না পারো, চোখে অশ্রু ঝরিও না।
জীবনের চতুর্কোণ থেকে জীবনের পথে
যদি রক্ষাকারী হতে না পারো, আক্রমণকারী হইয়ো না
যদি বেসামাল না হয়ে থাক, হতে চেষ্টা করো না।
ভণ্ডামি আর প্রতারণা দিয়ে, আমায় বোকা বানানোর চেষ্টা করো না।

তোমার শরীরে কোনোই বেদনা থাকে না যখন যখন ভালোবাসো
তোমার দু'হাত খালি বলে, আমার হাতও খালি করো না

তুমি পৃথিবী দেখোনি, আমার কাছে পৃথিবীর শপথ করো না
তুমি সাগর দেখোনি, ঝড়ের জন্য আমায় তৃষ্ণার্ত করো না।

ওহ নির্বাক বৃক্ষ

ওহ নির্বাক বৃক্ষ

তুমি নিজেই তো কুঠারটিকে একটি হাতল দিয়েছ
যাতে সে তোমার মূল কাটতে পারে।
সে তোমার ছায়াতে বিশ্রাম নেয়
এবং এরপর আবার তোমায় গোড়া কাটে
এটা পৃথিবীর কেমন নিয়ম?
ফাঁসির কাষ্ঠ তৈরি হয় তোমার কাঠ থেকে
শবাধার তৈরি হয় তোমার কাঠ থেকে
ওহ নির্বাক বৃক্ষ
পাতারা কি তোমার জিহ্বা নয়?

কী তোমার পরিচয়

যতদিন তুমি পাহাড়ে কিংবা উপত্যকায় নিরাপদে থাকবে
মাথা আর হাতের একটা যাযাবর বোঝা ছাড়া
কী পরিচয় তোমার?
একটি শহর, নৌকো বা গোসলখানা
কিংবা কোনো পুরস্কার কিছুই পেলে না–
দরবেশের জীবনে বাঁচলে শুধু লুকিয়ে গুহা-অরণ্যে।
মায়ের স্তনের পর সমরখন্দ বুখারা থেকেও সরেছ দূরে
হায়, কোথায় তোমার প্রিয় বাস্তুভিটে?
কুৎসিতমুখো বর্বরদের পাথরের লক্ষ্যবস্তু তুমি
পাহাড়ের কাঁটাওয়ালা ঝোঁপের লক্ষ্যবস্তু তুমি
সংকীর্ণ হৃদয় পৃথিবীর চোখ দেখছে না
হৃদয়ের বন্ধনহীন বুদ্বুদ তোমার।

তবু উন্নত মনোভূমিতেই তুমি বিচরণ করছ আজও।

কতবার ওরা কেটে দিয়েছে তোমার কণ্ঠ, তোমার পা
তবু উচ্চারণ কত স্পষ্ট তোমার, পা দু'টিও অগ্রসরমান
এবং যদি অর্ধমৃত থেকে থাক। উঠে দাঁড়াও।
আমি শুনাচ্ছি তোমায় রুদাকির কবিতা এবং মিনার ভার্স
এর পরও যদি তোমার শরীর এবং বিশ্বাস শুদ্ধ থাকে
ধন্যবাদ দেব হাফিজ আর রুমির কবিতাকে।"

(মূল তাজিকি থেকে ইংরেজি অনুবাদগুলো করেছেন কবি নিজে) ♦

মোবাইল ও স্মার্ট ফোন অদৃশ্য এক ভয়ঙ্কর নীরব ঘাতক

প্রফেসর ড. আবদুল জলিল

মোবাইল ও স্মার্ট ফোন আজ হাতে হাতে শোভা পায়। ইহা এক ঘাতক যা দৈহিক এবং মানসিক উভয় ক্ষতি সাধনে সক্ষম। অনেকেই ঘুমানোর আগে ফেসবুক পোষ্ট কিংবা ইনস্টাগ্রামের নিউজ ফিডে চোখ বুলাতে থাকেন। এক সময় তা বালিশের নিচে বা মাথার কাছে রেখেই দেন ঘুম। মোবাইল ফোন বালিশের নিচে কিংবা মাথার কাছে, ঘুমানোর কাছাকাছি কোন স্থানে রাখা বড় ঝুঁকিবহ। মোবাইল ফোন থেকে উৎসারিত বিকিরণ মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে এবং প্রচণ্ড মাথাব্যথা, মাংসপেশি ব্যথা কিংবা অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা ঘটাতে পারে[১]। মোবাইল থেকে নিঃসৃত ৯০০ মেগা হার্জ স্পন্দনের বিকিরণ সংকেত (signal) দেহের অঙ্গসমূহের কার্যকারিতা নষ্ট করার শক্তি রাখে। মোবাইল ফোন থেকে উৎসারিত রেডিয়েশন দেহে শোষিত হওয়ার সঙ্গে দেহের অঙ্গের কার্যকারিতার একটা যোগসূত্র রয়েছে। এটা অঙ্গের কর্ম ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে। মোবাইল ফোন থেকে বের হওয়া অতি বেগুনী (UV) রশ্মি ঘুমের ব্যঘাত ঘটায়। কারণ এই রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেকটাদৃশ্যমান আলোর সদৃশ। বিশেষ করে শিশুদের জন্য এই স্মার্টফোনটি বড়ই ঝুঁকিবহ বস্তু। কেউ বুঝতেই পারে না চোখের সামনেই শিশুদের কত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে[২]।

ঘুমানোর সময় মোবাইল ফোন দেহের থেকে কম পক্ষে 'তিন' ফুট দূরত্বে রাখা চাই৩। ঘুমাতে যাওয়ার আগে মোবাইল ফোনের সুইচ বন্ধ রাখা অথবা এরোপ্লেন মোডে রাখা যায়। অনেকে মোবাইল ফোনে অ্যালার্ম দিয়ে পাশে রেখে ঘুমান। কেউ কেউ আবার ঘুমানোর আগে ই-বুক পড়তে পছন্দ করেন। দেহ ও মন সুস্থ রাখাতে এই ধরনের খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করা হিতকর। প্রযুক্তির ইতিবাচকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকও রয়েছে। শিশুরা এর নেতিবাচক প্রভাবেরই শিকার। মোবাইল ফোন ব্যবহারে শিশুদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। মোবাইল ফোন যেমন শিশুর স্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্য কেড়ে নিচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে খেলার মাঠ ও স্বজনদের কাছ থেকেও দূরে সরিয়ে রাখছে। তারা গৃহবন্দী ও প্রাণচাঞ্চল্যহীন হয়ে পড়ছে। তাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। তারা নানা ধরনের ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। ২০ বছরের কম বয়সীরা, অন্যদের তুলনায় প্রায় ৫ গুন বেশি ঝুঁকি আশঙ্কায় রয়েছে ব্রেন (brain) টিউমারের। একটি দুই মিনিট স্থায়ী মোবাইল কল শিশুদের মস্তিষ্কে যে অতিসক্রিয়তা ঘটায়, তা পরবর্তী এক ঘন্টা পর্যন্ত মস্তিষ্কে বিরাজ করে। ফলেশিশুরা নানারকম জটিল রোগে আক্রান্ত হতে পারে; টিউমারের ঝুঁকি অনেকগুন বেশি। কেননা বড়দের চেয়ে শিশুদের বিকিরণপাত শোষণ ক্ষমতা শতকরা ৬০ ভাগ বেশি। তদুপরি অন্যান্য সমস্যার মধ্যে ক্লাস পারফরম্যান্স অবনয়ন, খিঁচুনি, অনিদ্রা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, শিশুদের জন্য তা আরোও মারাত্মক ক্ষতিকর কারণ শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশকে ব্যাহত করে। বিশ্বজুড়ে এখন শিশুরা মোবাইল ফোন নিয়ে খেলা করে। দিন দিন এ হার দ্রুত বাড়ছে। ফলে শিগগিরই হয়তো শিশুরা শিকার হতে পারে জড়বুদ্ধি, মেধাহীনতা ও প্রাণঘাতী মস্তিষ্কের ক্যান্সারের। মোবাইল ফোন ব্যবহারে শিশুদের শ্রবণ ক্ষমতাও হ্রাস পায়। অভিভাবকরা সতর্ক হলে এবং শিশুদের প্রতি যথাযথ যত্ন নিলেই আগামীতে সমৃদ্ধ জাতি গঠনে পরিপূর্ণ সুস্থ প্রজন্ম আশা করা যায়। মোবাইল ফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার বিপজ্জনকের চেয়েও বেশি কিছু। ১৫ মিনিট মোবাইল ফোনে কথা বললে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রী ফারেনহাইট বেড়ে যেতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ আরও বেশি বৈ কম নয়। ১৬ বছর বয়সের নিচে কোনো অবস্থাতেই মোবাইল ব্যবহার করা উচিত নয়।

আমাদের দেশে থাইরয়েডের ক্যান্সার, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী হাবাগোবা শিশু জন্মগ্রহণ ও বন্ধ্যাত্ব আগের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। সম্ভাব্য কারণ মোবাইল ফোনের অনিয়ন্ত্রিত অতি ব্যবহার। মোবাইলের বিকিরণপাত (exposure) অদৃশ্য, বর্ণ, গন্ধ ও শব্দহীন। তাই ইহা এক অদৃশ্য ঘাতক।

শিশুদের থেকে কমপক্ষে ৫ ফুট দূরে মোবাইল রাখা চাই। রাতে ঘুমানোর সময় মোবাইল কমপক্ষে ৭ ফুট দূরে রাখলে ভাল হবে। মোবাইল ফোনে কথা ২০ সেকেন্ডের মধ্যে শেষ করা সবচেয়ে ভালো। এর বাইরে প্রয়োজনে একটানা সর্বোচ্চ ৩ মিনিট কথা বলে পরবর্তী ব্যবহারের আগে ১৫ মিনিট বিরতি দেওয়া চাই। এই সময়ের মধ্যে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। সচরাচরমাথার পাশে ফোন ধরে কথা বলা হয়। কথা বলার সময় ফোন থেকে নিঃসৃত বিকিরণ মস্তিষ্কের কোষগুলোয় চলে আসে। তাই মস্তিষ্ক তথা দেহের অন্যান্য অংশেও প্রভাব পড়ে ও নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকির সৃষ্টি করে। মোবাইল ফোন থেকে উৎসারিত বিকিরণ আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে মেরেও ফেলতে পারে[৪]। মোবাইল ফোন থেকে উৎসারিত বিকিরণ তরঙ্গ আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলোকে উত্তপ্ত করে। কারসিনোজেনিক (Carcinogenic) বা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ইহা, অর্থাৎ মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার মস্তিষ্কের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। গর্ভাবস্থায় খুব বেশি মাত্রায় মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের, গর্ভস্থ ভ্রুণের মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয়ে থাকে। পরবর্তীতে এই শিশুদের মাঝে আচরণগত অনেক সমস্যাও দেখা দেয়। মোবাইল ফোন থেকে উৎসারিত রশ্মি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে ডিএনএকে (DNA)। কোনো কারণে মস্তিষ্কের কোষের ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা স্নায়ুবিক কাজের ক্ষতিসাধন করে। মোবাইল ফোনের বিকিরণপাত মস্তিষ্কের মেলাটনিনের পরিমাণ কমায় ফলে বিভিন্ন স্নায়ুবিক সমস্যা দেখা দেয়। এটি এখন প্রমাণিত যে, মোবাইল ফোন থেকে উৎসারিত তরঙ্গপাতে অনিদ্রা, অ্যালঝেইমার ও পারকিণসন ডিজিজের মতো বিভিন্ন ব্যাধি হয়। রক্তের লোহিত কণিকায় থাকা হিমোগ্লোবিন আলাদা হয় যেতে থাকে। হিমোগ্লোবিন রক্তের লোহিত কণিকার মাঝে তৈরি না হয়ে দেহের অন্যত্রও তৈরি হতে থাকে। হৃদযন্ত্রের কাছে বুকপকেটে ফোন রাখা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। যারা হার্টে পেসমেকার বসিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রেও মোবাইল ফোনের ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন চাই। যেসব পুরুষ বা ছেলে খুব বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন তাদের শুক্রাণু খুব দ্রুত নষ্ট হতে, শুক্রাণুর ঘনত্ব হ্রাস পেতে দেখা গেছে।

মোবাইল ফোন থেকে উৎসারিত বিকিরণপাত ঝুঁকিসমূহ ও তা এড়ানোর উপায়ঃ

উপর্যুক্ত বিষয়টি ভাল করে বুঝতে হলে সর্বাগ্রে জানা চাই মোবাইল ফোন কেমন করে কত শক্তিতে কাজ করে। শক্তির বিস্তরন ঘটে তরঙ্গাকার প্রবাহে। শক্তিভেদে তরঙ্গের রয়েছে নানা নামকরণ। যথাঃ স্বল্পতম শক্তির বেতার তরঙ্গ প্রবাহ বিকিরণ (শক্তি ১০-১৩বঠ থেকে ১০-১২বঠ পর্যায়ে), তারপর আসে

অবলোহিত বিকিরণ (শক্তি ১০-১২ বঠ থেকে ১.২৪ বঠ পর্যন্ত বিস্তৃত), তারপর আসে দৃশ্যমান আলো (১.৭৭ বঠ-৩.১বঠ), তারপরে আসে এক্স-রে (১.২৪ বঠ-১০.৩ বঠ), গামারে (১২৪ বঠ -১০৩ বঠ) আর তদুর্দ্ধ শক্তির কস্মিক রশ্মি। আমরা জানি গ্যাসীয় পদার্থে আয়নায়নের জন্য প্রায় ৩৪ বঠ শক্তিধর বিকিরণ দরকার হয়। এখানে বলতে হয় শক্তির একক electron Volt-য়ের সংক্ষেপন, বঠ। এখন মোবাইল ফোন কাজ করে মাইক্রোতরঙ্গ বিকিরণে যার শক্তি ০.০০১২৪ বঠ থেকে ১.২৪ বঠ, যা কিনা অনায়নক বিকিরণ৪। ফোনের অনায়নক বিকিরণপাত বস্তুর পরমাণুর বহিঃকক্ষস্থ ইলেকট্রনদের উত্তেজিত করে আড়মোড়ো ও কম্পনের সৃষ্টি করে দেহের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ফলে সৃষ্ট তাপে দেহের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়।

সাধারণতঃ দেহের কোটরে আবদ্ধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন চক্ষু, অণ্ডকোষ ইত্যাদি যাদের তাপসঞ্চলন ও পরিবাহিতা ক্ষমতা কম ও সর্বাগ্রে বিকিরণপাতের সম্মুখীন হওয়া দেহত্বক বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চোখে গগলস পরিধান করলে তাতে বিকিরণ শোষিত হয়ে চোখ রক্ষা পায়[৩]।

মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মাথা ব্যথা, চক্ষুপীড়া, ঝিমুনী, অবসন্নতা, বিরক্তি, বিষন্নতা, মানসিক চাপ, শ্বাসকষ্ট,স্মৃতিভ্রষ্টতা ইত্যাদি ঘটতে পারে[৩]।

যে কোন বিকিরণপাতের ক্ষতি এড়ানোর মূলনীতি হচ্ছে ৩টি যথাঃ

১. বিকিরণপাতের তথা মোবাইল ফোন ব্যহারের সময়কাল যতটা সম্ভব হ্রাস করা চাই। যত বেশি সময় ধরে ব্যবহার হবে তত বেশি বিকিরণপাত ঘটবে। তাই মোবাইল ব্যবহারকাল (Duration) বেঁধে দেওয়া দরকার;

২. ব্যবহারের তথা মোবাইল ফোন দেহাঙ্গ থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখতে হবে। কারণ বিকিরণপাতের পরিমাণ দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতে হ্রাস পায়। যেমন দূরত্ব দ্বিগুন বাড়ালে বিকিরণপাত চারগুণ হ্রাস পায়, ৩ গুন বাড়লে ৯ গুন হ্রাস ঘটে ইত্যাদি ইত্যাকার। এরূপ এমনটি ঘটে দূরত্ব বাড়ানোর সাথে সাথে; এবং

৩. বিকিরণরোধী বর্ম (Shield) দিয়ে বিকিরণ উৎস বা নিজেকে বা উভয়কে আবৃত করে রাখতে হবে। তাহা বিকিরণ শোষণ ও বিক্ষেপণ করে বিকিরণপাত হ্রাস করে দেবে।

উপর্যুক্ত নীতিসমূহের যে কোনটি বা একাধিক একত্রে অথবা প্রয়োজন বোধে সব কয়টি একযোগে প্রয়োগ করতে হতে পারে।♦

লেখক : প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক (অব), বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।

স্বাস্থ্যনিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনীতি

মো. জিয়াউর রহমান

আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানবজাতি। পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষ সেরা জীব। তাই মানব শরীরের স্বাস্থ্যও অতি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বে মানুষের কাছে অর্থনীতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু মানব শরীর বা মানুষের স্বাস্থ্য নিজেই একটি বড় অর্থনীতি যা অমূল্য। মানুষের সকল মৌলিক বিষয়ের গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি মানুষের স্বাস্থ্যকেও অতি মৌলিক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সেজন্য মানুষের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য একই রকম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। সমাজের অসাধু মানুষের জন্য আজ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টির সেরা মানুষের জীবন তথা স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসা কোন মতেই সভ্য সমাজের কাম্য নয়। মানুষের জীবিকার জন্য বা ব্যবসার জন্য বহু ক্ষেত্র রয়েছে। সেজন্য স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসা অমানবিক। কোন দেশ কতটা উন্নত, সভ্য ও মানবিক হয়েছে সেটাও সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিসেবার উপর নির্ভরশীল। মানুষের স্বাস্থ্যকে ঘিরে আজ বিশ্বব্যাপী বহু সিন্ডিকেট ব্যবসায় জড়িত। পৃথিবীর মানুষকে স্বাস্থ্যের বিষয়ে নতুন করে ভাবতে হবে, ব্যবসাকে পরিহার করে সকল মানুষের স্বাস্থ্যসেবা তৈরির ব্যাপারে নতুন আঙ্গিকে পরিকল্পনা নিতে হবে। নতুন

পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শুধুমাত্র স্বাস্থ্যসেবা সরকার ও অলাভজনব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে থাকাটা বর্তমান বিশ্বে বাঞ্চনীয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। সরকার ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কিভাবে বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা যায় এবং একইসাথে স্বাস্থ্যসেবার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার লক্ষ্যে তার উপর ব্যাপক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীর ধনী , দরিদ্র সকল শ্রেণীর মানুষের একই রকমের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে ভাবতে হবে এবং নতুন করে আলোচনায় নিয়ে আসতে হবে। ধনী দরিদ্রের বৈষম্য কমানোর জন্য যেমন ধনী দেশগুলোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে। তেমনি দরিদ্র দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য ধনী দেশগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পক্ষে এককভবে সক্রিয় কোন ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে না। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় দরিদ্র দেশগুলোর দরিদ্র বিমোচন ও স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নে কোন কার্যক্রর উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ দারিদ্রের হার কমিয়েছে সে সকল দেশের একান্ত প্রচেষ্টা, মানবিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব, অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মানবিক সেবা ও দরিদ্র জনগণের শ্রমের দ্বারা, কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশেষ উদ্যোগে নয়। তাই দারিদ্র বিমোচন ও স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে এতদিন যেসব নীতিমালাকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয়েছে সেসব বিষয়গুলি নতুন করে ভাবতে হবে। কারণ কোন কিছুই সার্বজনীন নয়, সময়ের প্রয়োজনে সবই পরিবর্তনশীল। সত্যিকারের দারিদ্র বিমোচন ও স্বাস্থ্যসেবার জন্য কোন বিশেষ মহলের স্বার্থ ছাড়াই উদ্ভাবনী ও জনকল্যাণমূলক পন্থা গ্রহণ করতে হবে।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অংশ হিসেবে জনগনের স্বাস্থ্য নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করে সর্বোচ্চ সেবাখাত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। স্বাস্থ্য নিরাপত্তা না থাকলে অর্জিত অর্থনীতি বালির বাধের মত যেকোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে। তাই রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নে স্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ সেবাখাত হিসেবে বিবেচনা করে দারিদ্র বিমোচন, কৃষি, কর্মসংস্থান, নারী ও শিশুর উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। স্বাস্থ্যনিরাপত্তাকে জাতীয় অর্থনীতির শক্তিশালী নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

সমাজে যদি হিংসা-বিদ্বেষের চর্চা করা হয় তাহলে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবে। তাই একটি সুন্দর মানবিক সমাজ গঠনের জন্য হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত

সমাজ গঠনের জন্য ভাল কাজের চর্চা করা প্রয়োজন। তেমনি মানুষের প্রকৃত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবসামুক্ত স্বাস্থ্যসেবা পরিচর্চা করা প্রয়োজন। ব্যবসামুক্ত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন সামাজিক নিরাপত্তা তৈরী হবে তেমনি সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রকৃত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ব্যবসামুক্ত স্বাস্থ্যসেবা বলতে স্বাস্থ্য সেবার সাথে লাভের কোন সম্পর্ক থাকবে না। এজন্য সরকার ও অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু ব্যবসামুক্ত স্বাস্থ্যসেবা নীতির ক্ষেত্রে একেক দেশ একেক নীতি অবলম্বন করতে পারে। তবে মূল প্রিন্সিপল থাকবে ব্যবসামুক্ত জনকল্যাণকর স্বাস্থ্যসেবা, যার সাথে লাভের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

আমরা যদি বিশ্বকে, রাষ্ট্রকে ও সমাজকে সুখময় করে গড়ে তুলতে চাই তাহলে স্বাস্থ্যকে সবার আগে গুরুত্ব দিতে হবে। কথায় বলে, " স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।" তাই সুখী-সমৃদ্ধ টেকসই রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের জন্য স্বাস্থ্যক সবার উপরে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

পৃথিবী তখনই স্থির থাকে যখনই বড় কোন রোগ-ব্যাধি ও মহামারী থেকে পৃথিবী দূরে থাকে। মহামারী করোনা দিয়ে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, মহামারী করোনাও পৃথিবীর মানুষকে স্বাস্থ্যগুরুত্ব নতুন করে বুঝাতে ও স্বাস্থ্যখাতের দুর্বল দিক চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তার বিষয়ে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। মানুষ মানুষের জন্য এই গানের শ্লোগানে মানুষের মাঝে মানবিকতা জাগ্রত করে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ ও ব্যবসামুক্ত স্বাস্থ্যসেবার নতুন পথের পরিকল্পনা উন্মুক্ত আলোতে নিয়ে আসতে হবে। অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যসেবার জন্য পূর্বের তত্ত্বকে শ্রেফ ডাটা হিসেবে বিবেচনা করে নতুন বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা ও ফরমোলা আবিষ্কার করতে হবে এবং নতুন ফরমোলায় মানবিক সেবাসমূহ বাস্তবে প্রয়োগ করে ও দারিদ্র ও স্বাস্থ্যহীনতা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। মানুষকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান সামাজিক নিরাপত্তাসহ অতি মৌলিক বিষয়সমূহ নিশ্চিত করতে পারলে দ্রুত দারিদ্র হ্রাস করা সম্ভব। এটিই সর্বোত্তম পন্থা হতে পারে। তাই এই বিষয়গুলো কার্যকরের জন্য কার্যকর পরিকল্পনা প্রয়োজন।

মহামারী করোনার পরবর্তী বিশ্বমানবিকতা, ধনী-দরীদ্রের বৈষম্যের হ্রাস, দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, মহৎ মানুষের সৃষ্টি ও মানব সেবায় মানবিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি ও বৈষম্যমুক্ত এক বিশ্ব গড়ে ওঠার অপার

সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। আর এই অপার সম্ভাবনায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ, বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণীর অংশগ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে সবার উপর মানুষ সত্য এই শ্লোগানকে সামনে রেখে।

বর্ডার দিয়ে দেশ বিভক্ত হলেও করোনা মহামারী দেখিয়ে দিয়েছে এই বিশ্বের সকল জনবল এক বিশ্বের নাগরিক। তাই এক দেশের শিশু তিন বেলা পেট ভরে খাবে আর এক দেশের শিশু ক্ষুধার্থ থাকবে, এক দেশের শিশু স্বাস্থ্যসেবা পাবে আর এক দেশের শিশু বিনা চিকিৎসায় অসুখে ভুগে মাতা-পিতার সামনে মৃত্যুবরণ করবে অথবা পুষ্টিহীণভাবে বেড়ে উঠবে যা চরম বৈষম্য ও অমানবিক। আজ বিশ্বের নাগরিক এই বৈষম্য ও চরম অমানবিকতা থেকে মুক্তি চায়। তাই বিশ্ব নেতৃত্ববৃন্দকে এই বৈষম্য দূরীকরণে এক হয়ে কাজ করতে হবে।

বিশ্বের বড় বড় নামী-দামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিষয়ে পড়ানো হয়। সময়ের সাথে সাথে নতুন বিষয়ের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু মানবিকতা বৃদ্ধি বা সৃষ্টির জন্য কোন বিষয় বা বিভাগ চালু করা হয়নি যা সবার আগে প্রয়োজন। সমাজে আজ থেকে অনেক বড় বড় নিশ্চিত ও ধনী শ্রেণীর সৃষ্টি হয় কিন্তু শিক্ষিত ও ধনী মানুষগুলো অমানবিক হয়ে গড়ে উঠেছে। ফলে সমাজে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণকর কর্মকাণ্ডও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। মানবিকতা সৃষ্টি করতে পারলে বিশ্বের সকল বৈষম্য ও বড় বড় সমস্যার সমাধান খুব সহজেই করা সম্ভব। কোন দেশ দারিদ্র বিমোচনে কতটুকু অবদান রাখলো সেটা ঐ দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা কতটুকু উন্নত সেটা দেখে সহজেই বুঝা যায়। তাই দেশের সার্ভিক উন্নয়নের সাথে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন জড়িত।

দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, নারী ও শিশুদের উন্নয়ন সামাজিক নিরাপত্তাসহ কর্মসূচীসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে বিদ্যুৎশক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠামোও গুরুত্বপূর্ণ। তবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও কৃষিতে উন্নয়ন সাধন করে অন্যান্য বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় সকল উন্নয়ন স্মার্টলেস চাকচিক্যে পরিণত হবে। কিন্তু আমরা যদি আক্ষরিক অর্থে শিক্ষিত ও মানবতাহীন অমার্জিত ধনী শ্রেণী তৈরী করি তাহলে দেখা যাবে যে, শুধুমাত্র অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে সুন্দর রাস্তা ও অট্টালিকা তৈরী হবে যেখানে বাস করবে ও রাস্তা দিয়ে চলালল করবে বিবেকবর্জীত অমানবিক মানুষ। যার অর্থ দাঁড়ায় সুন্দর বাড়ী, সুন্দর রাস্তা, সুন্দর গাড়ী আর অসুন্দর মানুষ; যাদের কাছে জাতি প্রতারণা আর বিকেকবর্জিত কর্ম ছাড়া কখনও

রাষ্ট্রের কল্যাণকর কোন কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। তাই সুন্দর জাতি গঠনের জন্য সুন্দর মনের রুচিশীল, মার্জিত ও মানবিক মানুষ দরকার । এজন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শিশু ও নারীর উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, অবকাঠামো ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী অতি মৌলিক বিবেচনা করে পরিকল্পনা নিয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা আবশ্যক। অন্যথায় সমাজে অসুন্দর ও অমানবিক এক শ্রেণীর ধনবান শ্রেণীর সৃষ্টি হবে।

কোন শিশুর জন্মগত পিতা-মাতা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে পিতামাতা শুধুমাত্র শিশুর পালন কর্তা। প্রতিটা শিশু রাষ্ট্রের অমূল্য সম্পদ। কারন প্রতিটি শিশু বড় হয়ে সে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের সেবা করে । একটি শিশু বড় হয়ে সে যদি কৃষক হয় তাহলে রাষ্ট্রের জনগণের জন্য শস্য ফলায়, খাদ্য উৎপাদন করে। আবার যদি ডাক্তার হয় তাহলে রাষ্ট্রের জনগনের চিকিৎসা সেবা দেয়। যদি রাষ্ট্রের কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয় তাহলে সে দেশের মানুষের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাই প্রতিটা শিশুকে রাষ্ট্রের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে রাষ্ট্রের সকল শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তাহলে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পালিত অধিকাংশ শিশু রাষ্ট্রের দক্ষ ও মানবিক জনশক্তিতে রূপান্তরিত হবে। ফলে রাষ্ট্র একটি উন্নত ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। তাই শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিনিয়োগ রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করবে।

ব্যক্তি উদ্যোগে মানবিক সেবা সমূহ তৈরী করে যখন কোন সংস্থার জন্ম হয় তখন তাকে আমরা মানবিক অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংগায়িত করতে পারি। মহৎ কোন ব্যক্তির হাত ধরে অলাভজনক বেসরকারী সেবামূলক সংস্থার জন্ম হয়। যখন কোন দেশে মহৎ ও মানবিক ব্যক্তির সংখ্যা সমাজে লোপ পায় তখন এই ধরনের সেবামূলক সংস্থা হ্রাস পায়। আবার মহৎ ব্যক্তিদের হাত ধরে কিছু অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জন্ম নিলেও তাদের মৃত্যুর পরে প্রতিষ্ঠান যোগ্য মানবিক নেতৃত্বের অভাবে প্রতিষ্ঠানটি মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পরবর্তীতে জনগনকে সেবা থেকে বঞ্চিত করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। বর্তমান বিশ্বে এই ধরনের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তারা যে মানবিক সেবাকে লক্ষ্য করে গড়ে উঠেছিল তা থেকে বিচ্যুত হয়ে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্টরা লাভবান হয়েছেন। কিন্তু দরিদ্রের দারিদ্র বিমোচন ও মানুষের সেবা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে আচার-আচরণে ও বাস্তবে কর্পোরেট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কোন অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সেবসমূহ পর্যবেক্ষণ করলে খুব সহজেই বুঝা

যাবে প্রতিষ্ঠানটি মানবিক সেবায় নিয়োজিত নাকি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। যেমন গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সেবা বলতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শিশুকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করতে পারি। যদি কোন প্রতিষ্ঠান নিজস্ব হসপিটাল-এর মাধ্যমে নামমাত্রমূল্যে অথবা বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির মাধ্যমে নামমাত্র মূল্যে কোয়ালিটি শিক্ষা দিয়ে থাকে তাহলে ধরে নেওয়া যায় প্রতিষ্ঠানটি তার প্রকৃত লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে। আর যদি কোন প্রতিষ্ঠান নামমাত্র সেবার নামে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জনগণের সেবার নামে প্রতারনা করে তাহলে বুঝতে হবে মানব সেবার নামে বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। সেজন্য শক্তিশালী মানবিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির লক্ষ্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়ন করা প্রয়োজন এবং কোন অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত আয় সরাসরি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও দারিদ্র বিমোচন খাতে ব্যয় হচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করা প্রয়োজন।

শক্তিশালী অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির জন্য সময়ে সময়ে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। কখনো ধনাঢ্য মানবিক ব্যক্তিদের উৎসাহের মাধ্যমে, কখনও সরকার সরকারী বড় প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে পুজি গঠন করে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার কার্যকর গ্রহণ করতে হবে। কারণ সরকারের পাশাপাশি সহায়ক শক্তি হিসেবে শক্তিশালী বেসরকারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ছাড়া মানবিক সেবা সৃষ্টি সম্ভব নয়। সরকার তথা জনগণের অর্থে সৃষ্টি জনগণের জন্য প্রতিষ্ঠিত অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যোগ্য মানবিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারলে সত্যিকারের সেবা তৈরী করা সহজ হবে এবং জনগণের প্রকৃত সেবার সুযোগ সৃষ্টি হবে। রাষ্ট্রও শক্তিশালী রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।

একটি বিষয় আমাদের মনে প্রাণে ধারণা করা প্রয়োজন তাহলো "যে বিষয়ের উপর আমরা উন্নতি করতে চাই সেই বিষয়ের উপর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন"। যেমন আমরা যদি আইটিতে উন্নতি করতে চাই তাহলে আইটি বিষয়ে আইটি বিশ্ববিদ্যালয়, মহাকাশ বিদ্যায় উন্নতি করতে চাইলে মহাকাশ বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়, দারিদ্র বিমোচনের জন্য দারিদ্র বিমোচন বিশ্ববিদ্যালয়, মানবিক মানুষ তৈরীর জন্য মানবিক বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাস্থ্য বিষয়ে উন্নতি করার জন্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি "পাবলিক হেল্‌থ বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপন করা প্রয়োজন । মানুষের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ের সচেতন মানুষ

তৈরীর জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রে মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি আবশ্যিকভাবে একটি 'স্বাস্থ্য টিভি' ও একটি "পাবলিক হেল্‌থ বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপন করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য টিভির মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনমূলক প্রোগ্রাম পরিচালিত করে জনগনকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করে জনগনের অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সহ একটি সুস্থ-সবল জাতি গঠন করা সম্ভব। আর তাই উদ্ভাবনী জনকল্যাণমুলক আইডিয়া "স্বাস্থ্য টিভি" বিষয়টি নিঃসন্দেহাতীতভাবে ও আবশ্যিকভাবে একটি সুস্থ-সবল জাতি গঠনে এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তার অমূল্য উদ্ভাবনী আইডিয়া হিসাবে কাজ করবে যা একটি পাবলিক হেল্‌থ বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকেও অনেক বেশী কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে "স্বাস্থ্য টিভি ও বাংলাদেশ" নামক গবেষণামূলক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে যা দেশে-বিদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান হলো তথ্য। তথ্য থেকে দ্বিতীয় কোন শক্তিশালী বস্তু নাই। তাই স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতন মূলক তথ্য জনগণকে স্বাস্থ্যশিক্ষায় ও জ্ঞানে শক্তিশালী করবে যা শুধুমাত্র স্বাস্থ্য টিভির মাধ্যমে সম্ভব। পাবলিক হেল্‌থ বিশ্ববিদ্যালয় একটি দেশের স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় শক্তিশালী দক্ষ জনবল তৈরী করবে এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। স্বাস্থ্য নিরাপত্তাকে সামনে রেখে এবং স্বাস্থ্য গুরুত্ব বিবেচনা করে আবশ্যিকভাবে পাবলিক হেল্‌থ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

মানবিক নেতৃত্ব ছাড়া দরিদ্র দেশগুলোর দারিদ্র বিমোচন কোন অর্থনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা সম্ভব নয়। যতদিন দরিদ্র মানুষগুলোর দারিদ্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবিক জীবনযাপন, তাদের শিশুদের ক্ষুধায় ভরা পেট, পুষ্টিহীন স্বাস্থ্য, বিনা চিকিৎসায় অকাল মৃত্যু, ক্ষুধার তাড়নায় শিশুশ্রম, শিক্ষা বঞ্চিত হয়ে গড়ে ওঠা এ বিষয়গুলো রাজনৈতিক মানবিক নেতৃবৃন্দের হৃদয়ে কঠিনভাবে নাড়া না দিবে এবং মানবিক নেতৃত্বের সৃষ্টি না হবে ততদিন শুধু অর্থনৈতিক তত্ত্ব দ্বারা দারিদ্রের কষাঘাত থেকে দরিদ্র জনগণের মুক্তির কোন পথ পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য দারিদ্রের মুক্তির একটাই পথ মানবিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব। স্বাস্থ্য নিপত্তার সাথে দারিদ্র বিমোচন ওতপ্রতোভাবে জড়িত। তাই দারিদ্রের বিমোচনের জন্য মানুষের সার্বজনীন স্বাস্থ্য নিরাপত্তা যেমন নিশ্চিত করতে হবে তেমটি দারিদ্র বিমোচনে শিক্ষা, কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য বিষয়গুলো প্রাধিকার হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। একটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব হলো একটি পরিকল্পনার ধারণা। তাই

মানবিক নেতৃত্বকে পৃথিবীর সামনে নিয়ে আসতে হবে এবং বিশ্বের দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে মানবিক নেতৃত্বকেই আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হতে হবে এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলো দারিদ্র বিমোচনে মানবিক নেতৃত্বের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে।

দারিদ্র বিমোচনের প্রধান উপাদানগুলো হলো স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী, যোগাযোগ, অবকাঠামো, নারী ও শিশু উন্নয়ন। এই উপাদানগুলোর কার্যকর উন্নয়ন যত বেশী সম্ভব তত বেশী দ্রুত টেকসই দারিদ্র বিমোচন সম্ভব, যাহা সম্পূর্ন নির্ভর করে মানবিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর। দারিদ্র বিমোচন অর্থনৈতিক তত্ত্বের কোন বিষয় নয়, এটি মানবিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিষয়। মানবিক নেতৃত্বকে দূরে সরিয়ে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা তত্ত্ব দারিদ্র বিমোচনে কোন অবদান রাখতে পারবে না। যা বর্তমান দরিদ্র দেশগুলিকে নিবীড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে অনুধাবন করা যাবে। তাই মানবিক নেতৃত্বের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের পথ সুগম করতে হবে বিকল্প অন্য কোন সমাধান নেই। তবে মানবিক নেতৃত্বের পরিকল্পনায় দারিদ্র বিমোচনসহ আর কোন কোন সমস্যাগুলো সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে সেগুলোর উপর উচ্চতর গবেষণার প্রয়োজন যা অর্থনৈতিকবিদসহ অন্যান্য গবেষকদের গবেষণার বিষয় হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যদি কোন দেশে দারিদ্র হ্রাস পায় সেটা ঐ দেশের মানবিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও দরিদ্র মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সম্ভব হয়েছে। এটি বিশ্বের যে কোন দারিদ্র হ্রাসকারী দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

তাই দারিদ্র বিমোচনে, ব্যক্তি স্বাস্থ্য নিশ্চয়তায়, পরিবারের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, সুস্থ-সবল জাতি গঠনে, মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে, মানবিকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে, অর্থনৈতিক নিরপত্তায়, জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে এবং জনগণের স্বাস্থ্য নিরাপত্তায় মানবিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে।♦

লেখক : গবেষক ও উপ-সচিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।